উৎসর্গ

পরমহংস মোহান্ত শ্রীমদ্ বলদেবানন্দ গিরি

শ্রীকরকমলে—

স্বামীজী,

আপনার পরকে আপন করিবার শক্তি অনন্যসাধারণ। যে কয়দিন আপনার পবিত্র আশ্রমে ছিলাম, সে কয়দিন যে দৃশ্য দেখিয়াছি—নর-নারায়ণের সেবার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। মানুষকে অযাচিত ভাবে ভালবাসিতে দেখিয়া বাস্তবিকই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। সে যাত্রায় আপনার স্নেহ-হস্তের স্পর্শে আমার শরীর ও মন সুস্থ হইয়াছিল। আপনি মালদহের প্রাণ। 'গৌড় পাণ্ডুয়া' সামান্য ভ্রমণ কাহিনী। তা হ'লেও মালদহের যা কিছু তা আপনার বড় আদরের জানিয়া আপনাকে ইহা উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

জন্মাষ্টমী
১৩২৯

গুণমুগ্ধ প্রণত
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

দুটা কথা

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ কাহিনী ১৩২১ সালে প্রকাশিত 'সঙ্কল্প' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। আমার সোদরপম বন্ধু, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের আগ্রহে ও যত্নে এতদিনে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠদেশ হইতে আহৃত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইল।

সৎ সাহিত্য প্রচারের সহায়ক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই সামান্য পুস্তকখানি দুর্গাচরণ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি উভয়েরই সাহিত্যসাধনা যেন জয়যুক্ত হয়।

জন্মাষ্টমী
১৩২৯

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মানচিত্র

পাণ্ডুয়া
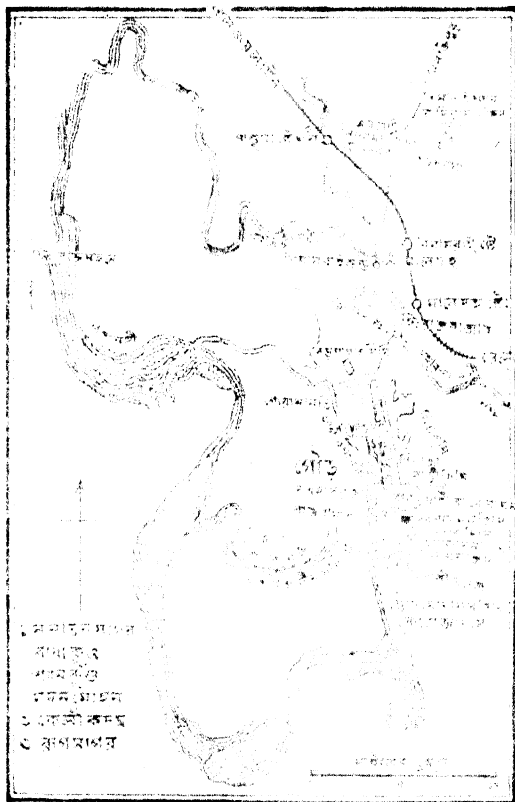
—:0:—

১৩২০ সালে মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম কলিগ্রাম অধিবেশনে আমার সোদরোপম আবাল্য-সুহৃৎ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভায়া তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"দেখিতে আসিয়াছি, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ—গৌড়ের বারদুয়ারী মস্‌জিদ, যাহার গম্বুজগুলি শত বৎসর পূর্ব্বে ক্রেটন সাহেব সুবর্ণপত্র দ্বারা মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন। * * * এক কথায় দেখিতে আসিয়াছি—প্রাচীন পাঠানকীর্ত্তি মুসলমান গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত হিন্দু গৌড় বা প্রাচীন রাজধানী 'রমাবতী'র ভগ্নাবশেষ। আর দেখিতে আসিয়াছি—বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকেলি;—প্রেমের অবতার বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদধূলিতে যে স্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে, সেই স্থান দেখিতে আসিয়াছি; যে স্থানে আমাদের প্রাণগোরা বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই কেলিকদম্বমূল দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি—শ্রীরূপসনাতন-সেবিত সেই মদনমোহন ঠাকুর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীরূপগোস্বামি-খনিত 'রূপসাগর' দীর্ঘিকা; আর দেখিতে আসিয়াছি—শ্রীপাট মহেশপুর—যে আম্রকাননে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীমদ্বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু কেশব-ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই কেশব ছত্রীর নিকট ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিমিরেই' পড়িয়া রহিলাম। একটি কুলীকেও দেখিতে পাইলাম না
নিরাশ হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া বলি
"আসুন, আপনারা ত কলিগ্রাম হইতে আসিতেছেন। শম্ভু কুলী
সন্ধান করিয়া আসিতেছে।" শম্ভুর অনুপস্থিতির কারণ বুঝিলাম। .
মিনিটের মধ্যেই স্বশরীরে শম্ভুর আবির্ভাব দেখিয়া পুলকিত হইলাম
সঙ্গে তাহার একটি মাত্র কুলী ও অপর একজন যুবক। যুবকে
আমাদের মোট-ঘাটারিগুলি কতক কুলীর মাথায়, কতক নিজেরা লই
চলিল। যুবকদিগের ব্যবহার দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। পরে জানি
পারিলাম, ছাত্রে দুইটি অমূল্য ভাগার কলেজের ছাত্র। অল্প সময়ের মধ্যে
নদীর তীরে আসিলাম। নদী এখন বিগত-শ্রী, পূর্ব্ব-বৈভবের কিছুই না
আছে শুধু স্মৃতি। বাস্তবিকই গৌড় পাণ্ডুয়া দেখিতে আসিলে পূর্ব্বস্মৃ
কথাই মনে পড়িয়া যায়। পারে একখানি খেয়া নৌকা দেখিলাম। মা
নিশ্চিন্তমনে তাহাতে নিদ্রাদেবার কোমল অঙ্কে শায়িত; শম্ভু ও যুবকদ্ব
চীৎকারে উঠিয়া সে এপারে আসিয়া আমাদিগকে পার করিয়া দি
তার পর আমরা কয়জনে চলিতে চলিতে রজনী বাবুর ধর্ম্মশালায় আ
উপস্থিত হইলাম। রজনীবাবু আগরওয়ালা; জাতিতে রাজপুত ক্ষে
তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও মধুরালাপী। পূর্ব্ব হইতেই এখানে আমা
থাকিবার জন্য স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার স্মর
বিগত অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরি
দিয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও সৌজন্য জীবনে ভুলিবার নয়—তিনি মালদহ
আপনার করিয়াছেন—মালদহের সকল শুভকার্য্যে তিনি একজন অগ্র
জলযোগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই বলিয়াও তাঁহার নিকট রক্ষা পাই
না। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমাদের জলযোগ করিতেই হইল।
ঘণ্টার মধ্যে কিরূপে যে তিনি এত আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝি

পারিলাম না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সে রাত্রির মত 'শয়নে পদ্মনাভ' করিলাম। প্রাতঃ কালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জলযোগান্তে শম্ভুনাথ ও যুবক দুইটি সাইকেল্‌-সাহায্যে গো-যানের চেষ্টায় বাহির হইল; কিন্তু অদৃষ্টবশে গো-যানও দুর্লভ হইয়া উঠিল; তখন ঘোষজা ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের পত্রের সাহায্যে পুলিশ পাহারাওয়ালার দ্বারা দুইখানি গাড়ী আনাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া এক বৃহৎ জনপদরূপে পরিগণিত ছিল। আংরেজাবাদের (ইংরাজ বাজারের) ১১ মাইল উত্তরে ও গৌড়ের ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন নবাব সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন পাণ্ডুয়ায় নাম ফিরোজাবাদ ছিল। কংসের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু কালবশে তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিরই অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী ছিল। কংসের পুত্র যদু জালালউদ্দিন গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বনজঙ্গল-পরিপূর্ণ বিরল-বসতি পাণ্ডুয়ায় মহানগরীর চিতাভস্ম দেখিয়া প্রাণে বড়ই দুঃখ হয়। এক সময়ে নগরীর দক্ষিণে কালিন্দী ও মহানন্দা নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সুরক্ষিত পুরাতন-মালদহ, পূর্ব্বপশ্চিমে রৈখান-দীঘী, উত্তরে একডালা দুর্গ বিরাজ করিত। নয়ন-রঞ্জন হর্ম্ম্যরাজি ও সুশোভন সমাধি ও মসজিদে সহর পরিপূর্ণ ছিল।

কালের বিচিত্রগতিতে সহরের সে সৌন্দর্য্য আর নাই—সে বর-বপু আর নাই—আছে তাহার কঙ্কাল! যাহা আছে, তাহাও এতদিনে ধ্বংস হইয়া যাইত; কিন্তু বড়লাট কার্জ্জন সাহেবের কৃপায় এখন এগুলি সুরক্ষিত হইতেছে।

তীর্থ-স্থল

মুসলমানদিগের নিকট হজরৎ পাণ্ডুয়া তীর্থ-স্থল। হজরৎ শা উদ্দীন ও হজরৎ নুরকুতব আলমের আবাসস্থল বলিয়া ইহা মুসল সন্ন্যাসীদিগের চিরাদৃত। বিশ্বাসী মুসলমানেরা দূরদূরান্তর হইতে বৎসরে দুইবার কাওয়া ও সিন্নি দিবার জন্য আসিয়া থাকেন। বড়দরগায় ও সাবনমাসে ছোটদরগায় দুইবার [illegible] দিন ধরিয়া মে থাকে; এই সময় সস-হাজারী ও বাইশ-হাজারী লাখেরাজ মতোয়ালীগণ সাধুসন্ন্যাসী ফকিরদিগকে পরম পরিতোষে সেব থাকেন। মেলায় প্রচুর পরিমাণে আমোদ প্রমোদও হইয়া থাকে

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখ এখনও ভাল অবস্থায় রক্ষিত আছে।

এবারে প্রথমে আমরা আদিনা মসজিদ তৎপরে অন্যান্য দ [illegible] 'বড় দরগা' দেখি; কিন্তু পূর্ব্ববারে যেরূপভাবে দেখি দর্শনকারীদের দেখিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া সেইরূপভাবে বর্ণনা করিলাম।

(১) আসানসন্তী ও সেলামী দর

পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ করিয়াই প্রথমে "আসানসন্তী দরগা"র দ [illegible] তৎপরে 'সেলামী দরগা' বা প্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া [illegible] বড় রাস্তার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। সেলামী দরগার সম্মুখে চত্বর আছে। কথিত আছে, হজরৎ শাহ জালালউদ্দীন তাবুরেজী স্থানে প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন ও উপাসনা করিতেন। এই দক্ষিণে একটি নিমগাছ ও কাঠচাঁপা গাছ আছে। প্রবাদ, নিমগাছ জালালের দন্তকাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই কাঠচাঁপা গাছের

তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যই গৌড়পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদ সকলে কাঠচাঁপা গাছের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

(২) বড়ি দর্‌গা বা শাহজালালের দর্‌গা।

সেলামী দরগা হইতে প্রায় ১০ রশি উত্তরে বড় দরগার সদর দরজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে "বাইশহাজারী অর্থাৎ সাধু ফকিরদিগের উপাসনার স্থান দরগা"ও বলে; কারণ পীরোত্তর জমি ২২০০০ বিঘা। এই দরগার মধ্যে আরবাইন খানা ও হজরৎ শাহজালালের অট্টালিকা সকল অবস্থিত।

(ক) জাম্‌-ই মস্‌জিদ।

সুলতান আলি মোবারক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে সাধুর ব্যবহারের জন্য এই সুবৃহৎ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শাহ নিয়ামতুল্লা ইহার সংস্কার করেন। মস্‌জিদের প্রস্তরফলকের বামধারে লিখিত আছে;—"এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার নির্ম্মাণ শেষ হইবার সময় মন্দির যেন উজ্জ্বল হয়।" অন্যত্র লিখিত আছে, "ইহা সাধু শাহজালালের মন্দির। পবিত্রচেতা শাহ নিয়ামতুল্লা ইহার সংস্কার করেন।" কথিত আছে, এই অট্টালিকার মধ্যে সাধু শাহজালাল যেখানে বসিতেন, সেখানে পূর্ব্বে রৌপ্য-রেলিং দ্বারা ঘেরা ছিল, এক্ষণে উহা অপহৃত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এই রেলিং (কাটরা) নবাব সিরাজুদ্দৌলা উপহার দেন; আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি রৌপ্য জল-পাত্র উপহার দেন। এখানে নুরুকুল জহানিয়া জেহান সেখের 'বান' (দণ্ড) ও পুরাতন নহবৎ সুরক্ষিত আছে। এই দরগায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রভূত উপকরণ পাওয়া যায়। আর এখানে দরগার পূর্ব্বে গৌড়ের কদমরসুল মসজিদস্থিত হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন ছিল। এই দরগার ভিতর :—

(খ) প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সমাধি আছে।

(গ) উহার বাম-পার্শ্বে এক গম্বুজ-বিশিষ্ট ঘরে চাঁ[illegible] খাঁ ও তাঁহার পুত্রের সমাধি আছে।

(ঘ) হাজী ইব্রাহিমের বড় কবর।

(ঙ) লক্ষ্মণসেনী দালান—

কারুকার্য্য-যুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ

দরবারগার পুষ্করিণীর উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহাও শাহ নিয়ামতুল্লা খনন করাইয়াছিলেন। পশ্চিম দেওয়ালের প্রস্তরলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বৈকাল রাজের পুত্র রামরাম দক্ষিণদিকের দালান পুনঃসংস্কার করেন।

এই অট্টালিকার নামকরণ-দৃষ্টে মনে হইতে পারে যে, ইহা হিন্দুর; কিন্তু মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, লক্ষণসেন নামে একজন মাতোয়ালী এখানে বাস করিতেন, এবং তাঁহারই নামানুসারে অট্টালিকার নামকরণ হইয়াছে।

(চ) এই দালানের দক্ষিণ-পশ্চিমে মিঠাতলাও পুষ্করিণী।

(ছ) চিল্লাখানা।

প্রবাদ আছে এইখানে হজরৎ নুরকুতুব আলম তপস্যা করিয়াছিলেন।

(জ) কারু-কার্য্য-যুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ।

(ঝ) ভাণ্ডার-খানা।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এই ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী চাঁদ খাঁ কর্তৃক দক্ষিণমুখী করিয়া নির্ম্মিত হয়।

(ঞ) তান্নুর খানা বা তন্দুর খানা।

এই ঘরে শাহ জালালের চুল্লী আছে। কথিত আছে, হজরৎ শাহ জালাল তাব্‌রেজী এই চুল্লী মস্তকে করিয়া স্বীয় গুরু সেখ সিহাবুদ্দীন সরওয়ারদীর আহারীয় দ্রব্য সিদ্ধ করিতেন। এই ঘরের দক্ষিণদিকের এক লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে সাহুল্লাকর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই লিপিখানি হইতে শাহজালাল সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

পারস্যের তাব্‌রেজ সহরে হজরৎ শাহজালাল জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থানের সেখ আবুসয়েদের তিনি শিষ্য হন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি সেখ

সিহাবুদ্দীন সহরওয়ারদীর ভৃত্য নিযুক্ত হন। কথিত আছে, সিহাবুদ্দীন প্রতিবৎসর মক্কায় তীর্থযাত্রা করিতেন; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাহিরের আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেই তাঁহাকে উদরাময় রোগে ভুগিতে হইত, এইকারণ জালালুদ্দীন মস্তকে একটি চুল্লী ও রন্ধনপাত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং সর্ব্বদাই উহা প্রজ্বলিত রাখিতেন ও আহারের সময়ে [illegible] উষ্ণ আহার সরবরাহ করিতেন। গুরুর মৃত্যুর পর শাহজালাল দিল্লীতে আগমন করেন। সেখানে দু' একজন বন্ধুর চক্রান্তে মিথ্যা কুৎসিত অপবাদে অভিযুক্ত হইয়া ত্বরায় বঙ্গদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

শাহজালাল বঙ্গদেশে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ফকির দরবেশের সেবায় সমস্তই উৎসর্গ করিয়া যান। সম্পত্তি সকল দরগার এলাকার অন্তর্গত ও "বাইশহাজারী" নামে অভিহিত। তাঁহার তিরোধানের সময় হইতেই তাঁহার "ফতিহা" রজব মাসে অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাসের ১ম হইতে ২২ দিনের মধ্যে বঙ্গদেশের নানাশ্রেণীর ফকির, দরবেশ ও ভিক্ষুক গণের সমাবেশ হইয়া থাকে। ২২ এ রজব ফতিহার দিন ২২টি গো, ২২ ছাগ, ২২ মণ তণ্ডুল সাধারণের প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত হয়। প্রত্যহই এক অভ্যাগত ফকিরদিগকে আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা আছে। মাতোয়ালীর [illegible] বার্ষিক আয় ১৮,০০০ টাকা। দুঃখের বিষয়, এত টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও মসজিদের সংস্কার হয় না। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মালদহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বোক্ত চুল্লী ব্যতীত 'শেখ-শুভোদয়া' নামে তাঁহার একখানি সংস্কৃত-বাঙ্গালা পুস্তক মসজিদে পাওয়া যায়।

(৩) ছোট দরগা।

বড় দরগার উত্তর-পশ্চিম কোণে, প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে রাস্তার বাম দিকে, ১২ মাইলের নিকট হজরৎ নুরকুতুব আলমের দরগা। ইহাকে

নূর কুতুব আলমের সমাধি

লোকে 'ছোট দরগা' বা 'ছয়-হাজারী দরগা' বলে; কারণ পীরোত্তর সম্পত্তি ছয় হাজার বিঘা। ইহা হজরৎ কুতুব আলমের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে ১৪-৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে কুতুব আলম চির-সমাহিত আছেন।

সাধুর আবাসস্থানে প্রবেশ করিবার যে প্রস্তরের সুন্দর দরজা আছে, তাহার আকৃতি পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। কথিত আছে, মুকদুম [illegible] একদা জনৈক ফকির ক্ষুৎপিপাসাকাতর হইয়া এখানে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই; তাহার দুর্ব্বল হস্তের চিহ্ন দরজার 'বাজুতে' এখনও মুদ্রিত আছে। এই দরগার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) মিঠা-তলাও পুষ্করিণী।

(খ) ইহার নিকটেই কুতুব সাহেবের ধাত্রী-মার সমাধি। এই সমাধিক্ষেত্রে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে হয়।

(গ) বেহস্ত-কা দরজা—এখানে কুতুব আলমের পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) নুর কুতুব আলম, তাঁহার পিতা আলাউল হক ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সমাধি। দরগায় সংরক্ষিত পীরোত্তর সম্পত্তির দান-পত্রিকা পাঠে জানিতে পারা যায়, নুর কুতুব আলম ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে (৮২৮ হিজিরায়) ও তাঁহার পিতা ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে (৭৮৬ হিজিরায়) মারা যান; কিন্তু জীবনবৃত্ত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে যথাক্রমে তাঁহাদের মৃত্যুর তারিখ ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ (৮৫১ হিজিরা) ও ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ (৮০০ হিজিরা) দেখা যায়।

(ঙ) চিল্লিখানা বা মাকান আরবাইন—

নুরকুতুব আলমের সমাধির পশ্চিমে অবস্থিত। গৃহটি পুরাতন হইলেও ছাদটি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই গৃহই সাধুর ভজনালয় ছিল। ইহার পূর্ব্ব পার্শ্বে তিনটি প্রবেশ-দ্বার এবং প্রত্যেকের শীর্ষদেশে একখানি করিয়া খোদিত লিপি আছে; কিন্তু এগুলি অপর মসজিদে সংলগ্ন ছিল। দক্ষিণের লিপিখানি নাসিরুদ্দীন মহম্মদ সাহেবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত এক মসজিদে সংলগ্ন ছিল; বামপার্শ্বের খানি ৫০৯ খৃষ্টাব্দে হোসেন

নুরকুতুব আলমের তোরণ

পাথরের বাক্স
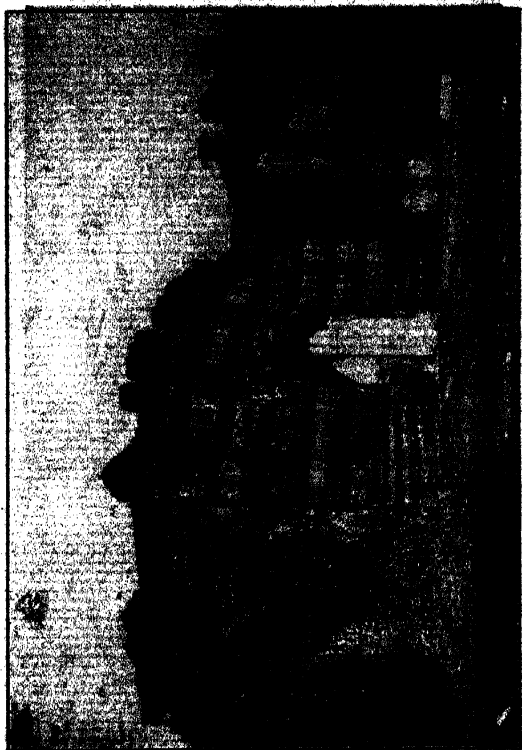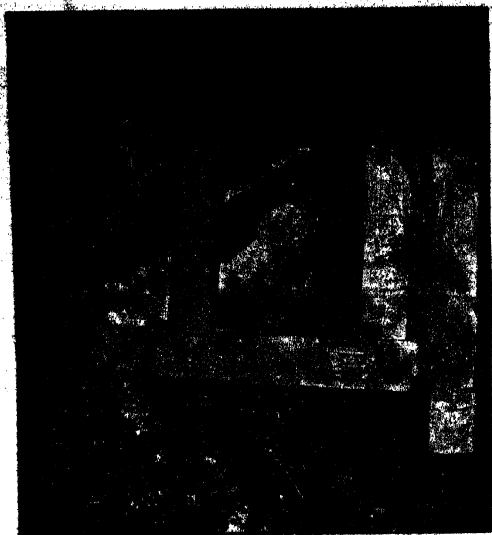
শাহের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত কোন মস্‌জিদে ছিল, এবং মধ্যের খানি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত সাধুর সুফী খানায় ছিল। লিপিগুলি সুপাঠ্য নহে।

চিল্লীখানা-সংলগ্ন রান্নাঘরের দরজায় একখানি লিপি হইতে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক সাধুর মৃত্যু হয় জানিতে পারা যায়। এ লিপি খানিও পূর্ব্বে অন্যত্র ছিল।

(চ) বেহেস্ত-কা-দরওয়াজা—

নূরকুতুব আলমের সমাধির দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সাধুর পৌত্র শাহ জাহিদ এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, ইহা মুসলমানদিগের নিকট

অতি পবিত্র। কথিত আছে, জিনে (ভূতে) পাওয়া লোকদিগকে এখানে আনিলেই তাহারা ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়।

এবার এইস্থানে এক সাধুর দেখা পাইলাম, তাঁহাকে এই স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। যত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, উত্তরে তিনি সুধু আপন মনে বকিতে লাগিলেন। অমূল্য ভায়া ফারসী আর্‌বীতে কথা বলিলেন, তথাপি উত্তর নাই। মনে হইল, লোকটা বুঝি পাগল; পরে আমি যখন ইংরাজিতে কথা কহিলাম, তখন তিনি হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন। জীবনের পূর্ব্ব ঘটনা বলিলেন—গোরখপুর বিদ্যালয়ের মাষ্টারির কথা বলিলেন; সংসার-ত্যাগের কথা বলিলেন—জানাইলেন তিনি সাধু বা ফকির নন—তিনি 'নবী' বা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা—বোধ হয় তাঁহার মান্য রাখিয়া আমরা কথা কহিতে পারি নাই, তাই প্রথমে আমাদের কথার উত্তর দেন নাই। পরে তিনি তুর্কীর যুদ্ধের সংবাদ চাহিলেন, আমরাও সাধ্যমত তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম; তুর্কীর পরাজয় শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ইনি বয়সে নবীন। দেখিলাম, নবীন 'নবী' রাজনীতির অনেক কথাই জানেন। আমরা কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে চাহিলেও তিনি আমাদের সঙ্গ লইলেন ও ছোট দরগার সকল স্থান দেখাইয়া অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া তিনি ঝড়ের মত কোথায় উধাও হইয়া গেলেন; বোধ হয় সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে বড় দরগার দিকে ছুটিলেন। বড় দরগা দেখিবার সময় তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়াছিলাম।

(ছ) সিজ্‌দা ঘর বা নমাজ-গৃহ—

শাহ কুতুব আলমের দরগার উত্তর দিকে অবস্থিত প্রাচীরবেষ্টিত স্থান। এই প্রাচীর গাত্রের লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মজ্‌লিসুল মজালিস নামক এক রাজ-কর্ম্মচারী ইহা ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। সম্ভবতঃ

ইনিই ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে একটি, ও [illegible] জেলায় আর একটি মস্জিদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

(ছ) মস্জিদ কাজিহুর—

ইহা তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ভগ্ন মস্জিদ। মখদুম আলাউল-হকের সমাধির সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৩৬ হাত এবং প্রস্থ ১৬ হাত। কাজিহুর এই মস্জিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি কাজিহাটায় রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার সংরক্ষণ-বিষয়ে মাতোয়ালীর আদৌ লক্ষ্য নাই।

(ঝ) প্রিন্স্ ইনায়তুল্লার কবর—

মিঠাতলাওর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইনি খোরাসান-বাসী ওমরাহ সরজায়ার পুত্র। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। কবরটি লম্বে ৬ ফিট ও উচ্চে ২ ফিট।

(ঞ) জেনানা মহল—

মস্জিদ কাজিহুরের উত্তরে বিবি-মহল। দেখিতে ভাগলপুরের 'গুম্ফা'র মত। এখানে 'হাম্মাম্' (স্নানাগার) 'গোসল চৌকী' ও 'বাসী ডুবি' পুকুর আছে। ইহা নুরকুতুব আলমের জেনানা ছিল। এখানে মীনা করা ইষ্টক প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ট) সোফিখানা।

(ঠ) বাবুর্চ্চি খানা।

এখানে এখন ডাকঘর হইয়াছে।

(ড) মুরিদ খানা—

এখানে সাধারণ লোকের সাক্ষাতে হিন্দুকে মুসলমান করা হইত। প্রবাদ আছে, রাজা গণেশের পুত্র যদুকে এখানে মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল।

(চ) মুসাফির খানা।

মুসাফির খানার দরজার চৌকাঠ কৃষ্ণবর্ণের কষ্টি-পাথর-নির্ম্মিত। ইহার উপর রাশিচক্র খোদিত আছে।

(ণ) তামার জয়ডঙ্কা।

বাঙ্গালার নবাব নাজিম মীরকাশিম প্রদত্ত দুইটী সুবৃহৎ তামার জয়ডঙ্কা মুসাফির খানার দরজার নিকট পড়িয়া আছে। একটীতে মীরকাশিমের নাম খোদিত আছে। ফকিরদিগের আহারের সময় এই দুইটী ডঙ্কা বাজান হইত। ইহার শব্দ শুনিয়া দূরাগত ফকিরেরা আহারের সময় নিরূপণ করিত।
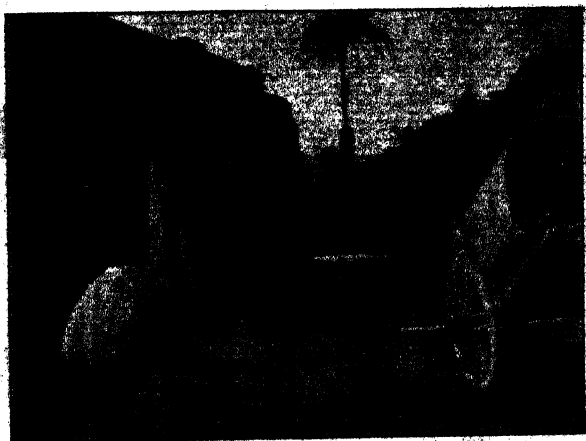
মুসাফিরখানার জয়ডঙ্কা

(৪) কুতুবসাহী মস্‌জিদ

ছোট দরগার কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বে ৮০ ফিঠ লম্বে ৪০ ফিট প্রস্থে একটী ছাদহীন চতুষ্কোণ মস্‌জিদ আছে। সাধারণে ইহাকে 'সোণা মস্‌জিদ' বলিয়া থাকে। এখানে তিনটী প্রস্তর-লিপি আছে। মাঝের দরজার মাথার উপর যে প্রস্তর লিপিখানি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহা মখদুম অখিদ রাজী নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।
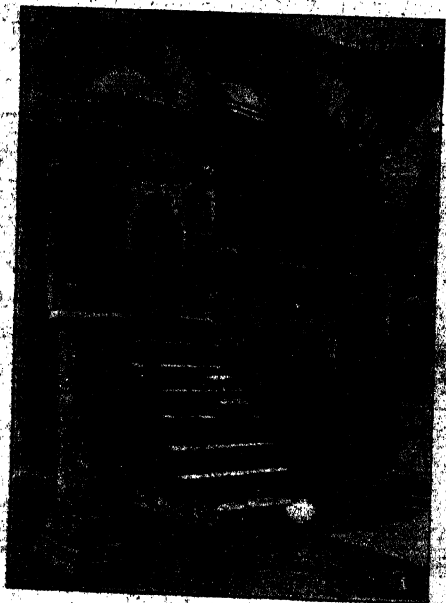
সোণা মস্‌জিদ্

এইস্থানে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের ভাষায় লিপিখানির অনুবাদ দিলাম :—

“এই মসজিদের ভিত্তি— মহম্মদ আলখালিদির পুত্র, মান্যাস্পদ ও ভক্তি-ভাজন সর্ব্বত্র সম্মানিত ধ্রুবতারার ধ্রুবতারা এবং পবিত্রতায় প্রস্রবণ মকতুম

সোনা মসজিদের ভিতরের দৃশ্য
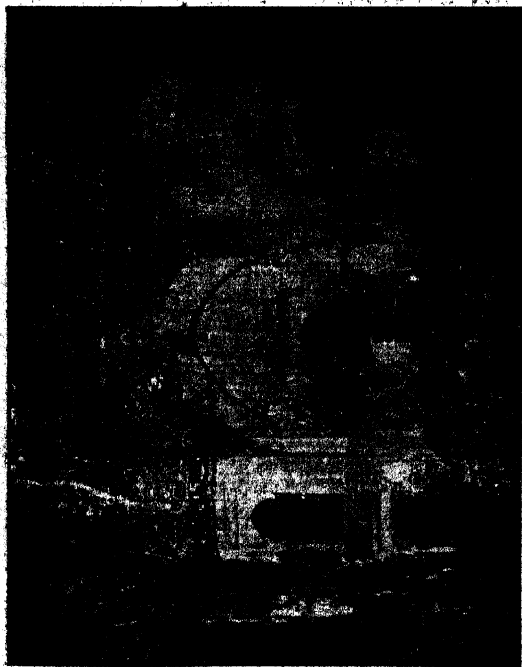
সেখ কর্ত্তৃক প্রোথিত হয়। ভগবান তাঁহার উন্নতির ছায়া বহু বিস্তৃত করুন, ইত্যাদি।" পূর্ব্বে ইহার প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ ফটক ছিল, কালবশে তাহার অস্তিত্ব এখন না থাকিলেও তাহার উপর যে লিপিখানি ছিল তাহা এখনও সুরক্ষিত রহিয়াছে। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মসজিদের দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে লেখা আছে :—

সোণা-মসজিদের মিম্বর
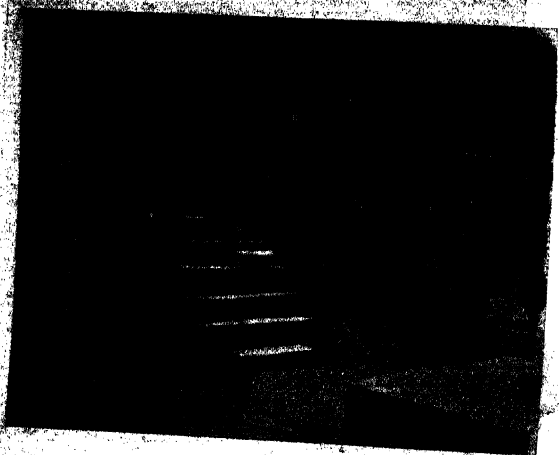
"মহম্মদ খালিদির পুত্র—দরিদ্র ও দীন, স্বর্গসূর্য্য বাসের ও নীতির আশা-ভরসার সভাস্থানের শশধর, মানবজাতির নেতা ও মহান্ শিক্ষক মকদুম জুহুর আলম—পরমেশ্বর তাঁহার বিশ্রাম স্থানের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করুন,—"

তৃতীয় লিপিখানি মেজর ফ্রাঙ্কলিন মসজিদের সম্মুখে দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহার এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন,—"সুলতান বারবক্ শাহের

সুলতান মহম্মদ শাহের পৌত্র, সুপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত সুলতান,
ও ধর্ম্মের ভাস্কর, যিনি নিজেও সুলতান-তনয়, সেই আবুল মোজাফ্ফর

সংস্কারের পূর্ব্বে সোণা মসজিদ

য়ুছুফ শাহ ; পরমেশ্বর তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখুন। ৮৮৫ হিজিরার মহরম মাসের ১৪ই তারিখ রোজ সোমবার।"
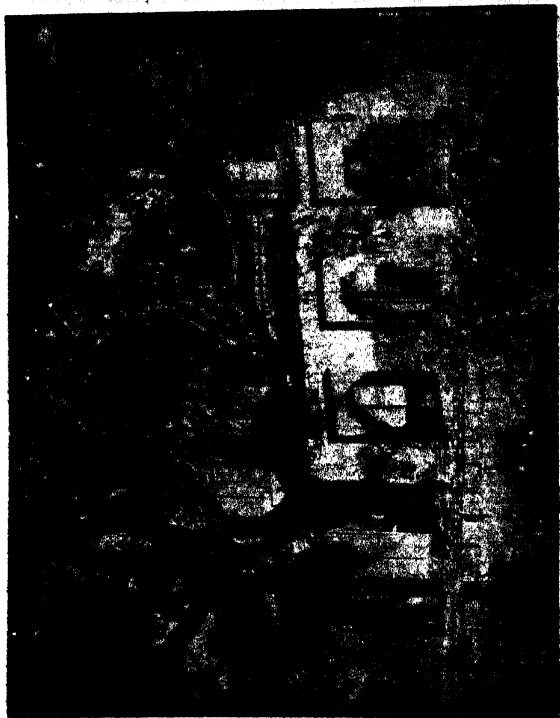
সোণা মস্‌জিদের বহিঃ-প্রাচীর

সম্ভবতঃ এই লিপিখানি এখানকার নয়। হজরত নূর কুতুব আলমের পবিত্র নামানুসারে ইহার "কুতুবসাহী মস্‌জিদ" নামকরণ হইয়াছে। অন্যান্য অট্টালিকা হইতে ইট ও পাথর আনিয়া এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মাঝখানে ৪টি পাথরের থাম আছে। খিলানগুলি থামের উপর ভর দিয়া আছে। থামগুলি বেশ মসৃণ নয়। এখানকার উপাসনামঞ্চ মিম্বর মনোরম। মসজিদের চারিকোণে চারিটি উচ্চ চূড়া আছে। চূড়ার মাথার উপর হরিৎবর্ণের মীণা-করা টালি ছিল। দূর হইতে এগুলি দেখিতে ঠিক সোণার মত। বোধ হয় এই জন্যই পূর্ব্বে এই মস্‌জিদকে "সোণা মসজিদ" বলিত। সংস্কারের পূর্ব্বে সোণা মস্‌জিদের ও ইহার বহির্ভাগের প্রাচীর-গাত্রের চিত্র প্রদত্ত হইল। এই মস্‌জিদের ন্যায় অন্যান্য অনেক মস্‌জিদ ও গৃহে নানাবর্ণের মীণা-করা ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ের লুটন মস্‌জিদের সমস্ত ইটই এইরূপ মীণা-করা। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌড়ের চিকা মস্‌জিদ বা জেলেও এইরূপ ইষ্টক প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১৪১৫ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁতিপাড়া মস্‌জিদেও এনামেল-করা ইষ্টক আছে। ইহা ১৪৪৫ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মীণা (এনামেল) করা ইষ্টক কবে কোথায় প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিংবা এই শিল্পের প্রচলন কোথা হইতে হইয়াছিল তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় ১৩১৬ সালের ঐতিহাসিক চিত্রে 'গৌড়নগরের এনামেল করা ইষ্টক' নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন, এই শিল্প চীনাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তাহারা প্রথমে এনামেল-করা থালা বাটী ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য সম্ভার লইয়া এদেশে আসিত। চীন ও বাঙ্গালা দেশের মধ্যে যে দূত প্রেরিত হইত তাহাও চীন দেশের মিঙ্গ্‌সী (Ming Shih) নামক ইতিহাস হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইতিহাসে

মিঙ্ (Ming) বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই-য়া-সি-টিং (Ai-ya-see-ting) নামক পাংকোলার (Pangkola) রাজা পাড়ুয়ার গয়েশউদ্দীন (Gaiya-szu--ting) নামক বাদশাহের নিকট ১৪০৮—১৪০৯ খৃষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করেন। দূতের সহিত যে সমুদায় চীনবাসী আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত বাদশাহকে উপঢৌকন স্বরূপ অশ্ব, অশ্বের জীন, সুবর্ণ এবং রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার ও শ্বেত বর্ণের চিত্র-বিচিত্র চীনামাটির পানপাত্র এবং বহুবিধ চীনের দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন। গয়েসউদ্দীন আবার ১৪১২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বহুতর উপহার সহ দূত প্রেরণ করেন। গৌড়ে অনেক চীনা আসিয়া বাস করিয়াছিল; এবং তাহারাই ১৪০৯—১৪১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়বাসীর সাহায্যে এনামেল প্রস্তুত করিত। এদেশের লোকেরা তাহাদের নিকট হইতে এই শিল্পের কৌশল শিখিয়া লইয়া নিজেরাই মীণা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। গৌড়দেশের মীণা-করা ইষ্টকের মস্‌জিদ সমুহের নির্ম্মাণের তারিখ দেখিলেও ইহাই প্রমাণিত হয়।

(৫) একলাখী মস্‌জিদ

সোণা মসজিদ ছাড়িয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইলে একটি অষ্টকোণ থাম-বিশিষ্ট সমাধিগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টক নির্ম্মিত এই সমাধি-ভবন নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল, তাই ইহার নাম 'এক লক্ষী' বা 'একলখী' মস্‌জিদ। ইহার উচ্চ গম্বুজের ব্যাস ৪৮½ ফিট। ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও এই মস্‌জিদ দেখিতে অতি সুন্দর। দেওয়ালগুলির বহির্ভাগে নানাবর্ণের মীণা-করা ইষ্টক আছে। গম্বুজের ভিতর চুণকাম করা। ইহাতে চারিটী ছোট দরজা আছে। দেওয়ালগুলি চওড়ায় ১৩ ফিট। প্রবেশ-দ্বারে হিন্দুর গণেশ-মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর অনেক দেবীমূর্ত্তিও ভগ্নাবস্থায় এখানে আছে। পাথরের চৌকাঠের

উপর আরও কয়েকটী হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। বোধ হয় মসজিদের উপকরণগুলি হিন্দু-দেবমন্দির হইতে গৃহীত। ইহার অভ্যন্তরভাগ কারু-

একলখী
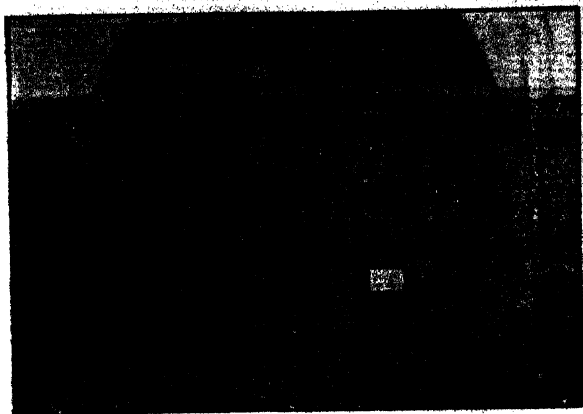
কার্য্যময়। ভিতরে তিনটি সমাধি আছে। 'রিয়াজুস সালাতিন'-প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে বামদিকের সমাধিটী রাজা কংসের পুত্র যদু জালালুদ্দীনের। গোলাম হোসেনের শিষ্য 'খুরসিদ-ই-জহাঁনামা'-প্রণেতা মুন্সী ইলাই বকস্ বলেন,—মধ্যের কবরটি যদুর পত্নীর ও তৎপার্শ্বে তাহার পুত্র আহম্মদ শাহার সমাধি।

এই মস্‌জিদ কবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না, কারণ এখানে কোন প্রকার প্রস্তরলিপি নাই; তবে ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ১৪১৪ হইতে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন

(৬) হিন্দুযুগের সেতু

একলখী হইতে আদিনা আসিবার পথে, ১২ মাইলের নিকট একটী
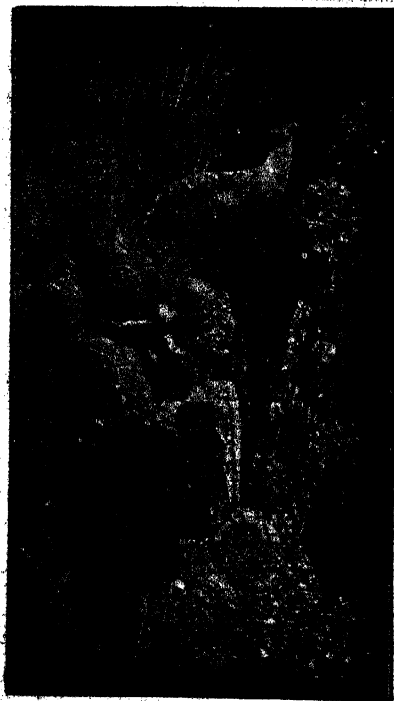
খোদিত মকর-মুখ

অতি পুরাতন হিন্দু রাজত্বকালে নির্ম্মিত সাঁকো দেখা যায়। সাঁকোর

নীচে নামিয়া আমরা কয়েকটি হিন্দুর দেবদেবীমূর্ত্তি ও হস্তীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম।

সংস্কারের পূর্ব্বে একলখী মসজিদ
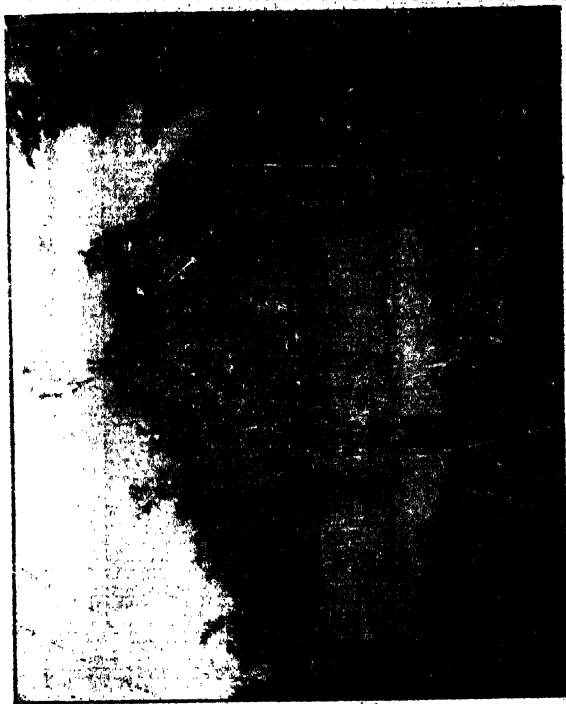
(৭) আদিনা

একলখী মস্‌জিদ হইতে দুই মাইল দূরে যে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই ভারত-বিশ্রুত 'আদিনা'। কালের
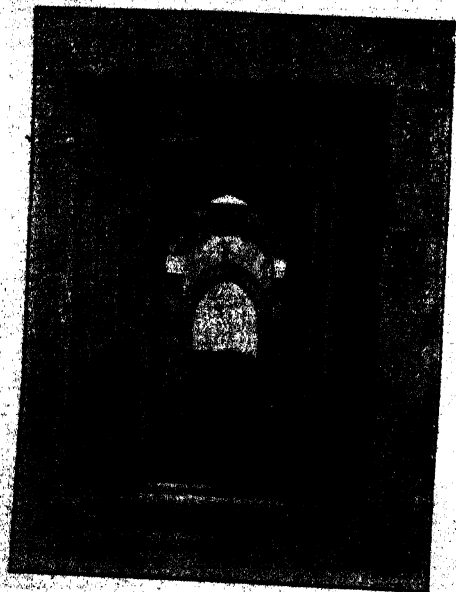
আদিনার পশ্চিম দিকের প্রবেশ-দ্বার

নির্ম্মম কবলে কতকাংশের ধ্বংস হইলেও যাহা আছে তাহা দেখিয়া, পাঠান-স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, আর পরিচয়

পাওয়া যায়, মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার। হজরৎ পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ-মধ্যে আদিনাই সর্ব্বপ্রধান। ভিতরে প্রবেশ করিলে ইহার শিলালতা ও কারুকার্য্যের সৌষ্ঠব-সুষমা প্রাণে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। কেমন করিয়া বড় বড় প্রস্তরখণ্ড এখানে আনীত হইয়াছিল—কত অর্থব্যয়ে, কত পরিশ্রমে, কত বুদ্ধিবলে যে, একার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ৫০৭½ ফিট, প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৮৫½ ফিট ও চওড়ায় ৬০ ফিট। নবাব সিকান্দর শাহ কর্ত্তৃক ইহা ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু 'রিয়াজুস-সলাতিন'-প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব সিকন্দর শাহ শুক্রবারের উপাসনার জন্য এই মসজিদ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য

আদিনা
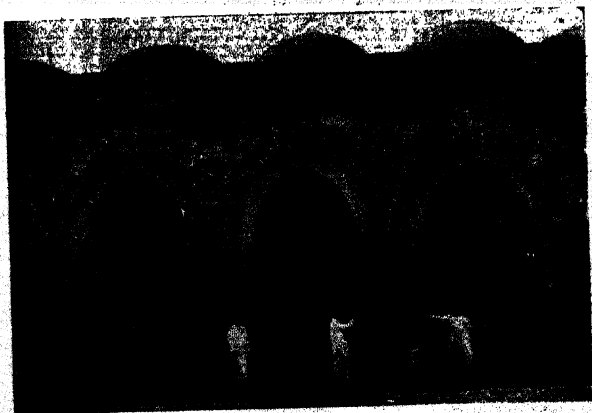
আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দেও কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইহা ১৩৫৮ হইতে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তুগ্‌রা অক্ষরে লিখিত প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, "জুম্মা-মস্‌জিদ, বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ আরব ও পারস্য দেশের নবাবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার প্রকৃতি নবাবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইবার আদেশ দেওয়া হয়। নবাব আবুল মুজিদ সিকান্দর শাহ দয়াময়ে একান্ত বিশ্বাসী। তাঁহার রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক, তিনি ৭৭৬ হিজিরায় রজবমাসের ৬ই তারিখে (১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) ইহা লিখিয়া দিলেন।" দুর্ব্বিনীত পুত্র সিকান্দর শাহ সোণারগাঁ হইতে পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বড়পাছিতে উপস্থিত হন। নবাব জানিতে পারিয়া পুত্রকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য গোয়ালপাড়ার নিকট চাতারের যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হন; কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরাজিত ও আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন, কোন প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ভাঙ্গিয়া ও হিন্দু দেবালয় হইতে সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা, এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রবেশ-দ্বারের শিরোভাগে প্রস্তর-খণ্ডে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত ছিল। প্রস্তর খণ্ডের পশ্চাৎভাগে এখনও কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান লেখকগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রস্তর-খোদিত হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি এরূপ ভাবে তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের সত্তা বুঝিতে পারা না যায়; কিন্তু তথাপি ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি। ফারগুসন সাহেবের মতে দামস-কাসের বৃহত্তম ও সর্ব্বপ্রধান মস্‌জিদের অনুকরণে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, এমন কি উভয়ের পরিমাপও একরূপ। কারুকার্য্য-খচিত নবাবের "বিশ্রাম-গৃহ" (chamber) সুন্দর ভাবে সুরক্ষিত। গৃহের

প্রাচীরগাত্র ১১ফিট পর্য্যন্ত মসৃণ কৃষ্ণ কষ্টি পাথরের ; তদুপরি ১২১/২ ফিট ইষ্টকের কার্য্য। এই ইষ্টকের উপর যে কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অতীব মনোরম। মসৃণ কৃষ্ণ-পাথরের দরজা ও জানালাগুলির তক্ষণ-কার্য্যের প্রশংসা সকলকেই করিতে হইবে।

মেজর ফ্রাঙ্কলিন, ফারগুসন, ক্যানিংহাম প্রমুখ বৈদেশিক পরিব্রাজকেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার ভূয়সী সুখ্যাতি করিয়াছেন। ফ্রাঙ্কলন সাহেব লিখিয়াছেন, —"মনোমোহকর, নয়নরঞ্জন এই বিরাট্ দৃশ্যের বর্ণনা ভাষায় করা যায় না— মহান্ শিল্পীর তুলিকায় ইহার বর্ণনা সম্ভব হইতে পারে। প্রশংসমান দর্শককে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে এসিয়া মহাদেশের কোন অট্টালিকাই সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে ইহার সহিত উপমিত হইতে পারে না। মোগল-গৌরবের পূর্ব্বে গৌড়ের নবাবদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, দানশীলতা ও ধর্ম্ম প্রাণতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। আর তৎকালীন স্থাপত্য-বিদ্যাও যে চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।"

ক্যানিংহাম সাহেবের মতে প্রবেশ-দ্বারের অভাবই আদিনা মস্‌জিদের বিশেষত্ব। কেবল পশ্চাৎভাগের দেওয়ালে দুইটী ছোট দরজা আছে; এবং ইহার ভিতর দিয়া নবাব ও তাঁহার পরিজনবর্গ ও মৌলবীরা প্রবেশ করিতেন। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের মধ্যভাগে সাধারণের প্রবেশ-পথ ছিল।

(ক) কিব্‌লা

মধ্যের খিলান-যুক্ত ছাদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে— "কিব্‌লা" বা প্রার্থনা স্থান। ইহার উত্তর দিকে ধর্ম্মপ্রচারের উচ্চাসন বা মিম্বার। পশ্চাৎভাগের দেওয়ালে বেশ সুন্দর কারুকার্য্য আছে; কিন্তু

তক্ষণ-কার্য্যগুলির গভীরতা দৃষ্ট হয় না। এখানে কোরাণের বয়েৎগুলি সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক তুগ্‌রা ও কুফিক অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে।

আদিনার মিহ্‌রাব।
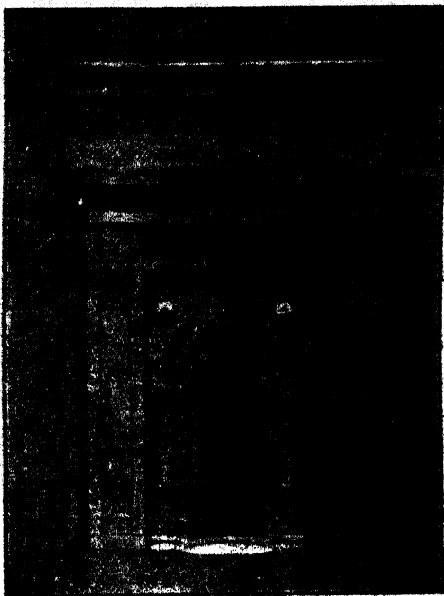
(খ) মিম্‌বার (The Pulpit)।

কিব্‌লার দক্ষিণ দিকে মিম্‌বার বা উচ্চবেদী। এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া ইমামেরা জনসংঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। কারুকার্য্য-সমন্বিত বহুমূল্য কৃষ্ণবর্ণ কষ্টিপাথরের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। সোপানগুলি সাং-ই-মুস

(hornablende) নির্ম্মিত। মিম্বারের নীচে একটি ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্য বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ গৃহ আছে।

আদিনার মিম্বার—উপাসনামঞ্চ

(গ) মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ দালান।
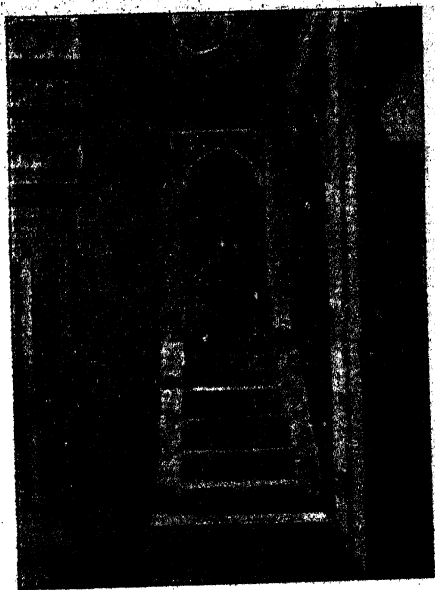
এই ঘর লম্বে ৬৪ ফিট ও প্রস্থে ৩৩ ফিট। ইহার প্রত্যেক দিকে ৫টী খিলান করা খোলা জায়গা আছে, ইহার ছাদ একটী গম্বুজ।

(খ) বাদসাহী তক্ত।

মস্‌জিদের উত্তরাংশে এবং মিম্বারের নিকটে যে স্থানে নবাব বসিতেন, সেই স্থানকে "বাদসাহী তক্ত" বলা হইত। ইহা ভূমি হইতে আট ফুট উচ্চ ২১টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। এখানে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার পৃথক্ আসন ছিল।

মিম্বারের অপর দৃশ্য
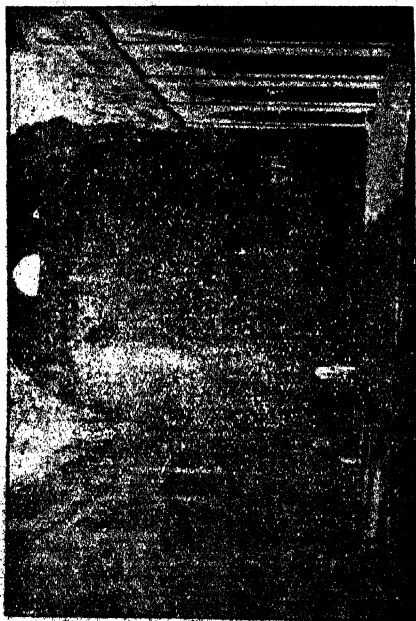
(ঙ) সেকন্দর শাহের গৃহ।

'বাদসাহী তক্ত''-সংলগ্ন ছাদহীন ৪২ফুট লম্বা ও ৪২ফুট চওড়া সম
াণ একটী গৃহ বাদশাহের গৃহ নামে পরিচিত। ইহাতে ৯টী গম্বুজ
। জুম্মা প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে নবাবের আত্মীয়-
রা এই গৃহে অবস্থান করিতেন। প্রবাদ আছে এই যে, এই গৃহের
। নবাবের সমাধি ছিল; কিন্তু যখন ছাদ পড়িয়া যায়, তখন রাবিসের
অনবধানতাবশতঃ কবরকেও ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক-
মতে এই মস্‌জিদের উত্তর দিকে নবাবের সমাধি-গৃহ ভগ্ন দশায়
। এই মস্‌জিদের পরিসামার বাহিরে তাঁহার পরিবারবর্গের সমাধি
।

রিসিদ জাহাননামার গ্রন্থকার সৈয়দ ইলাহিবক্স লিখিয়াছেন, সিকন্দার
নিজের হাতের মাপের চারি হাত ছিলেন। তিনি খুব লম্বা ছিলেন বলিয়া
ক তাঁহাকে 'ইস্‌কন্দার ছোটা' বলিত। বেভেরিজ সাহেবের মতে
অর্থ আলেকজেন্দার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ন্যূন নয়, তবে বয়সে কম।
exander the Younger & not Alexander the Less)
হের নির্ম্মাণকাল লইয়া ঐতিহাসিক দিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে
। যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ৭৭৬ হিজারায়
মাসে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

(৬) সাতাইশ ঘরা

াদিনা মস্‌জিদের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে, নবাব সেকন্দর
। প্রাসাদ ছিল; এখন কেবল উহার ধ্বংসাবশেষের ভিতর কেল্লি
র্' বা স্নানাগার আছে। ইহারই নাম "সাতাইশ ঘর"। রিয়াজুস-
ন-প্রণেতার মতে দিল্লীর হামামের অনুকরণে সামসুদ্দিন ইলিয়াস্‌

শাহ কর্তৃক এই হামাম্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২৪ ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট, অষ্টকোণযুক্ত একটী প্রকোষ্ঠ আছে। দক্ষিণ দিকের দুই পার্শ্বে ২টী ছোট ঘর আছে।
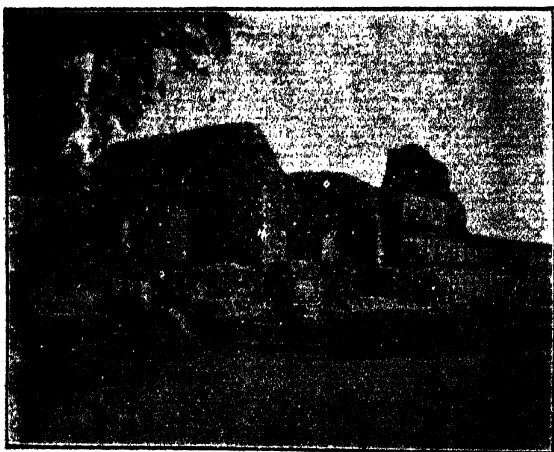
সেকন্দর শাহের গৃহ

এখানে ২০০×১০০ হাত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। ইহার কিয়দ্দূরে একটী সুন্দর গোসল-খানা আছে। এখান হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে "জীয়ৎ কুণ্ড" নামে আর একটি গোসল-খানা দেখিতে পাওয়া যায়।

আলাউলহকের সমাধি

(৭) দুর্গ

আদিনা হইতে সাতাইশ-ঘরা যাইবার মধ্য-পথে উচ্চ মৃত্তিকার পরিখা দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ইহাকে দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ সেকন্দার শাহ প্রাসাদকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত করিয়া থাকিবেন। দুর্গপ্রাকারের ও দুর্গপ্রবেশ-দ্বারের ভগ্নাবশেষ এখনও পাওয়া যায়।

হতশ্রী পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বগৌরব ও বৈভবের স্মৃতি দেখিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় লইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"চিরদিন কভু সমান না যায়।"

আদিনা মসজিদের সম্মুখেই ডাক্‌বাংলা। এইখানে বসিয়া আমরা পাঁচ জনে রসদের হাঁড়িটা শেষ করিয়া ফেলিলাম। গত বারেও সম্মিলন-সদস্যদিগের দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার এই খানেই সমাধা হয়। আর এই ডাক্‌বাংলার খোলা উঠানে জীবনে প্রথম সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদিগের নাচ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। সে কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী! যা'ক্ সে কথা। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গো-যানদ্বয়ে আমরা শয়নে পদ্মনাভ করিলাম। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমরা পথে আসিতে আসিতে এক বিপদে পড়িয়াছিলাম। অন্ধকার রাত্রে পথ ভুল করিয়া আমাদের গাড়ীখানি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া এক দহের মধ্যে পড়িয়া গেল। ঘুম ত ছুটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীগুলিও স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। সেখানে এত অধিক জল যে, আমরা নামিতে সাহস করিলাম না, এবং শ্রান্ত শিষ্ট বলীবর্দ্দদ্বয় কিছুতেই নামিতে চাহিল না। গুরুতর প্রহার ও চালকের সুমিষ্ট সম্বোধনে এক পদও নড়িল না। আমাদের গাড়ীর চালক প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি ও অপর গাড়োয়ানের নাম ধরিয়া চীৎকার করিবার পর,

গাড়োয়ান-প্রবর আমাদিগকে ফেলিয়া তাহার সঙ্গীকে ডাকিতে গেল। তখন আমাদের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা আর কি করিয়া বলিব, কারণ অমূল্য ভায়া ও আমি দুই জনই সন্তরণের 'স'ও জানি না। "বিপত্তৌ মধুসূদনঃ" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া, আর সাহসে ভর করিয়া গরুর দড়ি ধরিয়া বসিলাম; চালাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহারা একপদও অগ্রসর হইল না, তবে সুখের বিষয় আর বজ্জাতিও করিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দুই জন গাড়োয়ানের সম্মিলিত চেষ্টায় দহ পার হইয়া রক্ষা পাইলাম। আবার শয়ন করিলাম। একটু তন্দ্রা গিয়াছি, আবার গাড়োয়ানের মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"বাবু ফাঁড়িতে নিয়ে যায় যে।" সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম লাটসাহেব কারমাইকেল বাহাদুর পাণ্ডুয়া দেখিতে যাইবেন বলিয়া, রাস্তা মেরামত হইতেছে। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ীর সে পথ দিয়া চলন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই পথ দিয়া অন্ধকারে আমাদের গাড়ী একটু খানি না কি চলিয়াছে। আমি উঠিয়া পাহারাওয়ালাকে বলিলাম—বাবুসাহেব অন্ধকারে একটু ভুল হইয়া গিয়াছে মাপ করে দাও—আমরা কলিকাতা থেকে তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি, আর হাঙ্গাম হুজ্জত করো না'। লালপাগড়ী ত চটিয়াই লাল—"নেহি বাবু সাহেব, গাড়োয়ান হারামজাদ্ বড়া বদমাস হ্যায়—হাম উস্‌কো লে যায়েঙ্গে"; আমি বলিলাম,—'উস্‌কো তো লে যা'গা, হামলোক কাঁহা যায়েঙ্গে'। "এ বাৎ আমি নহি জান্‌তা—উস্‌কো জানেই হোগা' বলিয়া গরুর মুখ ধরিতে আসিল; তখন আমি নরম গরম কথায় তাহাকে তুষ্ট করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিলাম। গাড়োয়ানও অব্যাহতি পাইয়া মনের আনন্দে গাড়ী চালাইতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে রাত্রি দশটার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। অল্প হাটবার, বলিয়া গাড়োয়ানদিগকে ৪৲ টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইয়াছিল। অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া রজনী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তারপর

বিদায়ের পালা পড়িল। আমরা রজনী বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

তৎপরে কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে নৌকা করিয়া মালদহ মুকতুম-পুরে পরমহংস বলদেবানন্দ-গিরির আশ্রমাভিমুখে চলিলাম।

নৌকাতে উঠিয়া অবধি আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হইতে লাগিল; কয়েকবার ভেদ বমি করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের ভয় ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। নৌকা যখন মুকতুমপুরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন একরূপ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছি, ঘাট হইতে গোঁসাইজী হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও ডুলিসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও আমাকে এক ফোঁটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। তখন ধীরে ধীরে ডুলিতে উঠিলাম। ইহাই আমার জীবনে প্রথম ডুলি চড়া। যখন আশ্রমে উপস্থিত হইলাম তখনও আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। উদ্বিগ্ন বন্ধুদিগকে আশ্বাস দিয়া আর এক ফোঁটা ঔষধ সেবন করিয়া শয়ন করিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে গোঁসাইজী আসিয়া আবার একবার ঔষধ খাওয়াইয়া গেলেন। তারপর প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি শরীরটা বড় দুর্ব্বল। গোঁসাইজী আসিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। শুনিলাম তিন রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। এই সেবা-পরায়ণ দরিদ্র-নারায়ণের ভক্ত সাধকের যে চিত্র তাঁহার আশ্রমে আমরা কয়দিন দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মালদহবাসী দুঃস্থদিগের তিনি 'মা বাপ' বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মালদহের সর্ব্ব প্রকার জনহিতকর কর্ম্মে তিনি অগ্রণী। ইনি মির্জ্জাপুর-বাসী, পিতার মৃত্যুর পর মাতাঠাকুরাণীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি লইয়া প্রাণের আকুল আবেগে গুরুর সন্ধানে ছুটিতে থাকেন। তখন তিনি শিশু ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভগবৎ কৃপায় স্বামী যদুনন্দনের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কঠোর সাধনায় অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি [illegible] উন্নতি লাভ করেন এবং গুরুদেবের প্রিয় পাত্র হন। [illegible] সালে নেপাল-প্রত্যাগত মহাযোগী পরমহংস কানাই লাল মালদহে আসিয়া উপস্থিত হন। কাশী ধামে তাঁহার মঠ আছে। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিমান সাধক খুব অল্পই ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসীদিগের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যদুনন্দনের কয়টি শিষ্যকে তিনি মন্ত্র দান করেন; অতি অল্প দিনের মধ্যে বিশ বৎসর বয়সের যুবা বলদেবানন্দ সাধনা বলে ও পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সিদ্ধি লাভ করিয়া দুরূহ 'পরমহংসত্ব' লাভ করেন। স্বামী যদুনন্দনগীর ইংরাজি ১৯১১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ৯৭ বৎসর বয়সে সাধোনাচিত ধামে গমন করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বলদেবানন্দ যথারীতি ভোগ-রাগ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহার গুরুদেবের সমাধি প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব কার্য্য ছয়দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। সাধু সন্ন্যাসীর পূত রজ স্পর্শে মালদহ পবিত্র হইয়াছিল। অভ্যাগত মালদহবাসী প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হন নাই—আর সে কদিন অভুক্ত ছিল না মালদহের হিন্দু মুসলমান কাঙ্গালী, মুকদুমপুর মঠের বার্ষিক আয় একটা বড় রাজ-রাজড়ার আয়ের মত, কিন্তু সংসার বিরাগী বালব্রহ্মচারী অকৃতদার বলদেবানন্দ এই আয়ের টাকা যেরূপ সদ্ব্যবহার করেন তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দিত হইতে হয়। ভোগবিলাস তাঁহার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আয় হইতে প্রতি বৎসর সাধু-সন্ন্যাসীদিগের কম্বল ও বস্ত্রের জন্য ৪০০০৲ টাকা খরচ করেন, বক্রী টাকায় দুঃস্থ মালদহবাসীদিগের অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধের জন্য খরচ করিয়া থাকেন। তিনি একজন হোমিওপ্যাথির সুচিকিৎসক। তিনি প্রত্যহ শতাধিক রোগীর ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানের অহঙ্কার তাঁহার নাই।

[illegible] সৌন্দর্য্যজ্ঞানী বলিয়াই বোধ হয়।
[illegible] নিজ আনন্দের কবিরা লইয়াছেন। সৌন্দর্য্যদর্শন
[illegible] নিজস্ব পত্তীগ্রাম উন্নতির জন্ত মুক্তহস্তে
[illegible] নিম্নে ভজনদেবের সমাধির নিকট দণ্ডায়মান তাঁহার
[illegible]

শ্রীমদ্‌ বলদেবানন্দ গিরি

বাঙ্গলায় গীত রচনা করিতে ইনি সুদক্ষ। সর্ব্বোপরি ইঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার আশ্রমের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফল-ফুলের বিষয়েও ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কাশীধামের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ইঁহাকে "মোহান্ত" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। এই উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে জেলার কালেক্টর সাহেব

[illegible] —

হইতে মহামতি বড় লাট লর্ড কার্জন [illegible] আমন্ত্রিত হইয়া [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই সময়ে মালদহবাসী তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যে উপহার প্রদান করেন, এবং যাহা ১৩১৯ সালের ৩০শে মাঘ তারিখের মালদহ সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অবিকল প্রতিলিপি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

আজি এই শুভদিনে, মিলি সব বন্ধুগণে,
এই প্রীতি উপহার করিছি অর্পণ।
লহ ভাই স্মিত মুখে, বেঁচে কাজ কর সুখে
দেখে সবে হই সদা আনন্দে মগন॥
দয়ার সাগর হ'য়ে, ঔষধাম্ন বিতরিয়ে,
যে দুর্লভ যশ ভাই করিছ অর্জ্জন।
সে যশ অক্ষুণ্ণ রেখে, নির্ম্মল আনন্দ সুখে,
কর্ম্মক্ষেত্রে আগুয়ান হও অনুক্ষণ॥
মালদহর নিজ-ধন, গম্ভীরার সম্মিলন,
করিয়ে কাব্যের বীজ করিছ পোষণ।
ফুটিলে কবিত্ব ফুল, কাব্যামোদী অলিকুল,
আসি সবে মধু-পানে হবে নিমগন॥
সালিশ-বৈঠক করি, বরষিছ শান্তিবারি,
চিন্তাতপ অর্থনাশ করি নিবারণ।
জীবের সাধন যাহা, সাধন করিছ তাহা,
মানখ্যাতি এইরূপে করিছ অর্জ্জন॥
কর্ম্মক্ষেত্রে একগত, সৎকার্য্যে থাক রত,
জীবন সফল করি ধন্য কর ধাম।
জ্ঞানের কিরণ ছটা, দূর করি মোহ ঘটা,
সার্থক করুক তব এ "মোহান্ত" নাম॥

ইনি পরমহংস দেব শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম গিরি-সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী। স্বামী চেতনগীর প্রথমে মুকদুমপুরে মঠ স্থাপন করেন। নিম্নে আমরা তাঁহার শিষ্য পরাম্পরার তালিকা প্রদান করিলাম।

চেতনগীর
।
শঙ্কর
।
উত্তম
।
জাহির
।
উমেদ
।
চয়ন
।
খরগগীর

চেতনগীর কোন্ সময়ে প্রথম এখানে আসিয়া মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে শুনা যায় পাঠান রাজত্বের সময়ে তিনি বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন।
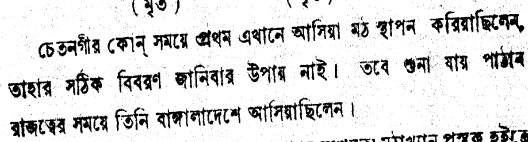
এক্ষণে আমরা দশনামী সম্প্রদায়ের প্রথম বংশলতা মঠাখ্যান পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দশনামী যথা—১) তীরথ, (তীর্থ) (২) আশ্রম (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) পুরী, (৯) ভারতী, (১০) সরস্বতী।

জগৎগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য
দ্বারিকা সারদামঠ
(পশ্চিম)
স্বরূপাচার্য্য
পুরী-ভোগ গোবর্দ্ধনমঠ
(পূর্ব্ব)
পদ্মপাদাচার্য্য
বদরিকাশ্রম-যোগীমঠ
(উত্তর)
নিরাতোটকাচার্য্য
মহীশূর শৃঙ্গেরীমঠ
(দক্ষিণ)
অনুভূতি পৃথিবী উদরাচার্য্য
কক্ষ তীরথ
(১)
দণ্ডী
কুরন আশ্রম
(২)
দণ্ডী
বাশটবন
(৩)
শম্ভু আরণ্য
(৪)
নারায়ণ গীর
(৫)
পূরণ পর্ব্বত
(৬)
রাম সাগর
(৭)
নিত্যানন্দপুরী
(৮)
হস্তামল ভারতী
(৯)
বিদ্যানন্দ সরস্বতী
(১০)
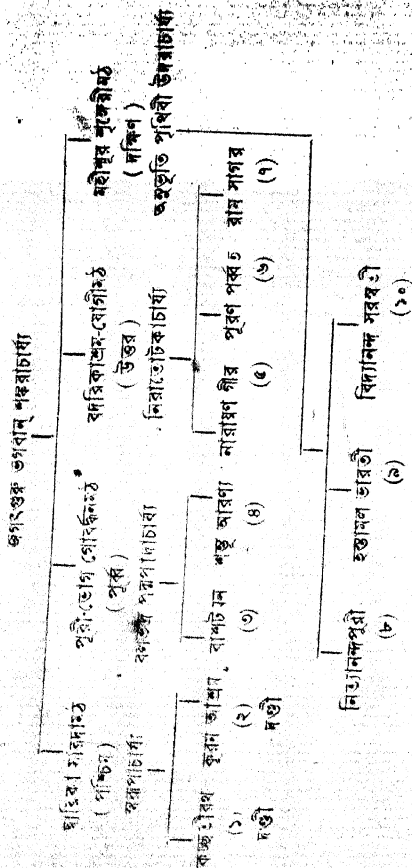
জগৎগুরু ভারতের চারিদিকে চারিজন শিষ্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যেরাই দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

বলদেবানন্দকে মহেশপুরের গোঁসাই মহোদয় মৃত্যুকালে উইল দ্বারা একজিকিউটার ও সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান।

মহেশপুর মঠের আয় মুকন্দপুর মঠের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। ইনিও সুশৃঙ্খলার সহিত এই মঠের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

শিক্ষার উন্নতি কল্পে ইনি খুব উৎসাহী। ইনি মালদহে ইঁহার গুরুদেবের নামে 'যদুনন্দন মহাকালী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করিয়া বালিকাদের বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

বন্ধুরা উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আহারাদিতে মনোযোগ দিলেন, কারণ ৮টার সময়ে ঘোড়ার গাড়ী আসিবে—সেই সময় বাহির না হইলে একদিনে মোটামুটি রকমে গৌড় দেখা অসম্ভব। যথাসময়ে গাড়ী আসিলে আমিও যাইতে চাহিলাম। আমার কথায় সকলে আপত্তি করিলেন, কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও একযাত্রায় পৃথক্ ফল হইতে পারে না বলায়, তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। আমিও গোঁসাই-জীর আশীর্ব্বাদ লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

গৌড়

——:o:——

ভারত-বিশ্রুত বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়-নগর এক সময়ে ধনৈশ্বর্য্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় হিন্দু মুসলমানগণ এখানে বাস করিতেন। এখানকার তীক্ষ্ণধী পণ্ডীতগণের জ্ঞান-গরিমা অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিতগণের খ্যাতিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল।

গৌড় উত্তর দক্ষিণে ৭½ মাইল ও বিস্তারে এক হইতে দুই মাইল। ইহার বর্গফল ১৩ বর্গ মাইল। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টনের মতে ২০ বর্গ মাইল। পর্ত্তুগিজ ঐতিহাসিক ফেরিয়া-সুজা (Fariay Souza) ষোড়শ শতকে গৌড়ের কীর্ত্তিকাহিনী যাহা লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এখানকার অধিবাসির সংখ্যা ১২০০০০০ বার লক্ষ ছিল। পূজা-পার্ব্বণে এখানে এরূপ জনতা হইত যে, শতশত লোক ভিড়ের জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। রাস্তা সকল বিস্তৃত ছিল, এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে ছায়া শীতল বৃক্ষসকল রোপিত ছিল। গৌড়ের চারি পার্শ্বে মৃত্তিকার উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের উপর অট্টালিকা সকল সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত করিত। পশ্চাতে ভাগীরথী কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছেন, শত্রু আক্রমণ হইতেও আবশ্যক হইলে পলায়নের সুবিধার জন্য নগরকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তরও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল।

দে বারোস্ও (De Barros) শা' সুজার ন্যায় নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অবশ্য বলিয়া রাখা ভাল আমরা প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী বা মুসলমান গৌড়ের ভ্রমণবৃত্তান্তই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। দুইবারই তাহাই দেখিয়াছি। হিন্দু-গৌড় বা সেনগণের রাজধানী "রামাবতী" দেখিবার সুবিধা আমাদের ঘটে নাই। অবশ্য একথা এখন ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, বিজয়ী মুসলমানেরা হিন্দুর নগরীকে মুসলমানের নগরে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন—হিন্দুর মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছেন। মসজিদের ইষ্টকগুলির বিপরীত দিক অবলোকন করিলে, কোন না কোন হিন্দু দেবদেবীর ভগ্ন বা অভগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

হায়, কালের বিচিত্র গতিতে মুসলমান গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তি একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ যাহা আছে, তাহা লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের অনুকম্পায় এখনও ধূলিসাৎ না হইয়া কতক সুরক্ষিত হইয়াছে।

আর সুধু কালের দোষ দিলেই বা চলিবে কেন? জমীদারদিগের নিকট হইতে মুর্শিদাবাদের নিজামৎ দপ্তরে বৎসর সালিয়ানা ৮০০৲ টাকা করিয়া মীনাকরা ইষ্টক ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ভঙ্গ করিবার জন্য রাজস্ব আদায় হইত। মালদহের এমন বাড়ী নাই যাহাতে গৌড়ের ইষ্টক নাই।

হিন্দু-মুসলমান, যদি স্মৃতির শ্মশান দেখিতে চাও, যদি ইষ্টকনির্ম্মিত মসজিদের কারুকার্য্য দেখিতে চাও—যদি উদ্ভাবনী শক্তির ও পূর্ত্তকার্য্যের প্রতিভা দেখিতে চাও, তবে বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরে আইস। দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইবে—নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা বহির্গত হইবে, আর ভাবিবে এই সকল শিল্পিগণের বংশধরেরা কোথায় গেল—যাহারা সামান্য ইষ্টকের উপর মূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাহাদিগকে জীবন্তের মত প্রতিভাত করিতে পারিয়াছিল—যাহাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি-পরিকল্পনা এত সুন্দর

ছিল—যাহাদের তক্ষণ কার্য্য দেখিয়া বড় বড় ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণ মুক্ত কণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, তাহাদের বংশধরেরা এখন কোথায় ?

সেই স্মৃতির শ্মশান দেখিতে চলিলাম। প্রথমবার মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে যখন গৌড় দেখিতে গিয়াছিলাম তখন গো-যানেই গিয়াছিলাম। সেবার আমার সোদর-প্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া হস্তীর উপরে লইতে চাহিলে, আমি যাইতে স্বীকৃত হই নাই ; কারণ ঘোটকপৃষ্ঠে এমন কি রাজভাগ-পৃষ্ঠেও যে কখনও চড়ে নাই, সে কিরূপে হস্তীর উপরে চড়িবে ? এবার কিন্তু দশ মাইল পথ কলিগ্রামের পথে 'পবন পিয়ারী' নামক সুবৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া কলিগ্রামে গিয়াছিলাম। যা'ক্ সেকথা।

সহর ত্যাগ করিয়া আমরা দক্ষিণদিকে একটী উচ্চ রাজপথ দেখিলাম। এই পথ বক্রভাবে ক্রমে "বাগবাড়ী" বা "বাঘবাড়ী" পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইংরাজ লেখকগণের মতে ইহাই "গিয়াসউদ্দীনের বাঁধ।" কাহারও কাহারও মতে ইহা সেন-রাজগণের সময় বন্যা হইতে রাজধানী-রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই বাঁধ ছাড়াইয়া রাজপথ নিম্ন জলাভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে দেড় মাইল পথ দূরে "গোঁদোর আইল" ও নিম্নভূমি "গোঁদোর আইলের বিল" নামে পরিচিত। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ পোর্চ্চ সাহেব ঐই বিলকে প্রাচীনকালে বহমানা গঙ্গার ত্যক্ত-খাত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। গঙ্গার এই খাত ও সাদুল্লাপুর-পার্শ্ববাহিনী ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন গৌড়ের সমুদয় ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের নাম "সোমদহ" (সমধা) (ও) "ভাতিয়া" বিল।

এবারে এই স্থানে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল গৌড় দেখিবার জন্য আসিয়াতেছেন বলিয়া রাস্তা-ঘাট ও

পুলগুলি মেরামত হইতেছিল। ঐরূপ একটী পুলের কাছে আসিলেই মিস্ত্রীরা আমাদিগকে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিল না। আমাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহারা বলিল, 'এ পুল আমরা এখন ঠিক করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আর দুইটী পুল খোলা হইয়াছে, সেখান দিয়া আপনারা কিছুতেই যাইতে পারিবেন না।' এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ ওভারসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার বাবু রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া একজন সর্দ্দারকে বলিলেন, "ইহারা কোথাকার লোক? যাবেন যান্। কোথায় যান দেখি"। আমারা তাঁদের নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া গৌড় দেখিবার সঙ্কল্প জানাইলাম; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁহারা কিছুতেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে চাহিলেন না। তখন অগত্যা গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। ২০।২৫ হাত অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় দেখি একজন সাইকেল করিয়া দ্রুতবেগে আমাদের কাছে আসিতেছেন; ভদ্র-লোক আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথাকার লোক, আপনাদের মালদহে কোন দিনই ত দেখি নাই, ভদ্রতা আপনারা কি জানেন না, ইঞ্জিনিয়ার বাবু আপনাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন, তবু আপনারা যাইবেন! উনি যদি সাহেব হইতেন তাহা হইলে আপনারা কি করিতেন? আচ্ছা যান্ জলে ডুবিয়া থাকিতে হইবে'—এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, "বাবুরা আমার জাত-ভাই বলিয়া হাতে ধরিয়াছি, কাতরে গৌড় দেখিবার জন্য ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহাতেও মন পাই নাই, আর যদি উহারা ইংরাজ হইতেন, তাহা হইলে সুদূর কলিকাতা হইতে ভদ্রলোকেরা গৌড় দেখিতে আসিতেছে শুনিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতেন। আমরা কলিকাতবাসী, আমরা ত চিরকালই অভদ্র, কারণ আমরা হাতে ধরিয়াছি, শ্রীচরণে ধরিতেও প্রস্তুত আছি, বলেন ত আপনার কাছেই তাহার বায়নাটা দিয়া রাখি,

কিন্তু যাত্রাটা সুগম করিয়া দিতে হইবে। দোষ আমাদের সত্য, কারণ আমরা বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর নিকট কৃপা ভিক্ষা চাহিয়াছি—দোষ আমাদের, কারণ আমাদের ন্যায্য অধিকারের উপর দাঁড়াই নাই, আমরা তাঁহার মুখের উপর বলি নাই পথ যদি বন্ধ তবে 'পথ বন্ধ' (No thoroughfare) বলিয়া লিখিয়া দেন নাই কেন? আমরা অবশ্য যাইব।" আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোক (পরে জানিলাম ইনিই কনট্রাক্টর বাবু) বলিলেন, "মহাশয় আমিও কলিকাতার লোক, দশ বৎসর এখানে আছি। আপনার কোন ভাবনা নাই। বড় পুলটা এখন আপনাদের যাবার মত করিয়া দি—আসিবার সময় ঠিক করিয়া রাখিব। যত লোক লাগে আমি লাগাইয়া রাত্রি ৮।৯ টার মধ্যে ঠিক করিয়া রাখিব।" উত্তরে আমি হাসিয়া বলিলাম "শত ধন্যবাদ; মহাশয় আর যা করেন সব সহিতে পারিব, কিন্তু ঐ একটা কথা—জলে ডুবান ওটা করবেন না, কারণ আমি সাঁতারের 'স' পর্য্যন্ত জানি না।" তখন তিনি বলিলেন, "মহাশয় আর লজ্জা দেবেন না—আজ আমার খুব শিক্ষা হয়েছে, আসুন ফিরিবার সময় পুল ঠিক না হইলে আপনাকে মাথায় করিয়া পার করিয়া দিব"। আমি বলিলাম, "মহাশয় আমাকে এতটা স্বার্থপর মনে করিবেন না, আমি এপারে—আর আমার বন্ধুরা ওপারে পড়িয়া থাকিবেন; হয়তঃ একদিন বন্ধুবান্ধবদের এপারে ফেলিয়া রাখিয়া ওপারে চলিয়া যাইব; কিন্তু সে দিনটা বোধ হয় এখনও নিকটবর্ত্তী হয় নাই।" তখন তিনি বলিলেন, "না, মহাশয় আপনাদের গাড়ীসুদ্ধই কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিব, যান।" আমরাও প্রাণের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিশ্চিন্তমনে চলিতে লাগিলাম।

তিন মাইল অতিক্রম করিয়া একটী বাঁধা পুষ্করিণীর নিকট রাজপথ একটী গড়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই গড় পশ্চিমদিকে বড় সাগর দীঘি ও শাহুল্লাপুরের গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(১) বড় সাগর-দীঘি

হাণ্টার সাহেবের মতে ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম জলাশয়, পাহাড়সমেত দীর্ঘে এক মাইল ও প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল। পুষ্করিণীর দৈর্ঘ্য ১৬০০ গজ ও প্রস্থ ৮০০ গজ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহা হইতেই

ফিরোজ-মিনার

প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা হিন্দুদিগের দ্বারা খনিত হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার খননকার্য্য আরম্ভ হয়। এই সুবৃহৎ জলাশয়ের ছয়টী ৬০ গজ প্রশস্ত সোপান ছিল, এক্ষণে সেগুলির ভগ্ন ইষ্টকাদি পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে চারিটী পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরে ও দুইটী উত্তর-দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

সাগর-দীঘির পশ্চিম তীরের দৃশ্য অতীব সুন্দর।

(২) মুক্‌তুম আখি শিরাজুদ্দীনের সমাধি

বড় সাগর-দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে মুক্‌তুম্ শাহ্ নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের সমাধি। এই স্থান বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে দুইটী সুন্দর খিলান আছে। মস্‌জিদের বাহির দিকের উত্তর দ্বারস্থ খোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, "বিখ্যাত সাধু মুক্‌তুম্ শেখ আখি শিরাজ-উদ্দীনের সমাধি-দ্বার, সৈয়দ আসরফ উল্‌হোসেনীর পুত্র মহা-প্রতাপশালী সদাশয় সম্রাট্ 'অালাউদ্দীন আবুল মোজাফর হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক ৯১৬ হিজরীতে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। শোভন আল্লা তাহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন।" মেজর ফ্রাঙ্কলীন বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বারে 'তোগ্‌রা' অক্ষরে অপর একটী প্রতিলিপি আছে, যাহার অর্থ হইতেছে, যে, "ভগবানের নিকট সাহায্য পাইয়া জয় আমাদের করতল-গত। ভগবানই বিশ্বাসীর রক্ষক—তিনিই দয়াময়।"

(৩) জান্‌জান্ মিয়ান্ মস্‌জিদ

পূর্ব্বোক্ত সমাধির নিকটে মীনাকরা খোদিত ইষ্টক নির্ম্মিত (Embossed brick) এই সুন্দর মস্‌জিদ আছে। জান্ জান্ মিয়ান্ নাম্নী রমণীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া, তাহারই নামানুসারে ইহা 'জান্ জান্ মিয়ান্

মস্‌জিদ' নামে প্রসিদ্ধ। মস্‌জিদের ভিতরে কয়েকটী কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর স্তম্ভ আছে। ইহার ছাদের অবস্থা অনেকটা ভাল। গম্বুজগুলি এখনও অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া আছে; মধ্য-দ্বারে যে লিপি আছে, তাহার ভাবার্থ এই, "মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, ভগবানের একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ

লুটন মস্‌জিদ

করে, সে স্বর্গে তদনুরূপ থাকিবার বাসস্থান প্রাপ্ত হয়।" এই মসজিদ ৯৪৩ হিজরী সালে ১৫৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হোসেন শাহের পুত্র সম্রাট্ গিয়াসুদ্দীন আবুল মোজাফর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখান হইতে সা'দুল্লাহপুরের ঘাট প্রায় এক মাইল দূরে।

(৪) সা'দুল্লাহপুরের ঘাট

একটী ক্ষুদ্র সরু পথ দিয়া ভাগীরথীর এই ঘাটে যাওয়া যায়; ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র ঘাট। মুসলমান-শাসন-সময়ে এইস্থানে হিন্দুদিগের মৃতদেহের সৎকার হইত—ক্রিয়াকর্ম্মাদিও অনুষ্ঠিত হইত। এখনও পূজা-পার্ব্বণে এইস্থানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তীরে একটী প্রাচীন বৃক্ষ কয়েকটি ছোট ছোট গাছের সঙ্গে মিশিয়া একটি স্বাভাবিক কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া আতপতাপ হইতে রক্ষা পান ও বিশ্রামসুখ লাভ করেন।

আরও তিন মাইল অতিক্রম করিলে একটী উঁচু গড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম কাটাগড়। এই গড়, পশ্চিমদিকে কালাপাহাড়, লোহাগড় ও পাতালচণ্ডী নামক গড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। লোহাগড় গৌড়ের পোতাশ্রয় বন্দর ছিল। ইহা পূর্ব্বদিকে ভাতিয়ার বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই গৌড়ের পূর্ব্বসীমা।

(৫) পিয়াসবাড়ী দীঘি

আরও দুই মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা পিয়াসবাড়ীতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। ইহা পথের বামপার্শ্বে অষ্টম মাইলে অবস্থিত। এই দীঘির পাহাড় খুব উচ্চ, এখানে জেলাবোর্ডের একটী বাংলা আছে।

'আইন-ই-আকবরী, গ্রন্থে ইহার বর্ণনা এইরূপ আছে—"স্মরণাতীত কাল হইতে 'পিয়াসবাড়ী' (তৃষ্ণাবাস) দীঘির জল লোকে বিষাক্ত বলিয়া

বিশ্বাস করে। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদিগকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, ও তাহাদিগকে এই পুষ্করিণীর বিষাক্ত জল পান করিতে দিয়া মারিয়া ফেলা হইত। আকবর শাহ্ এই বিধান রহিত করিয়া দেন।"

এখান হইতে আমরা সর্ব্বাগ্রে বড় সোণামস্‌জিদ দেখিতে চলিলাম।

(৬) বড় সোণামস্‌জিদ

বড় সোণামস্‌জিদ বা বারোদুয়ারী মস্‌জিদ রামকেলিগ্রামে অবস্থিত। এইটীই গৌড়ের মস্‌জিদগুলির মধ্যে বৃহত্তম; কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইহা গৌড়ের মধ্যে সুন্দরতম মস্‌জিদ্; কিন্তু আমাদের নিকট তাঁতিপাড়া মস্‌জিদই সুন্দরতম বলিয়া প্রতীত হইল। এখন এই মস্‌জিদে কোনরূপ প্রস্তর-ফলক বা শিলালিপি নাই, যাহা হইতে নির্ম্মাণ-সময় স্থির করা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রেটন ও ফ্রাঙ্কলিন সাহেব শিলালিপি দৃষ্টে স্থির করিয়াছিলেন বাদসাহ হোসেন শাহ্ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন ও তাঁহার পুত্র নসরৎশা ৯৩২ হিজিরায় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দে) সম্পন্ন করেন।

ইহার অপর নাম 'বার-দুয়ারী'; বার দুয়ারী হইলেও ইহাতে ১১টী মাত্র দ্বার আছে। বারান্দার উভয় পার্শ্বে ১১টী খিলান ও তদুপরি গম্বুজ আছে। কাহারও কাহারও মতে 'বারদুয়ারী' নামকরণের কারণ দ্বাদশ দ্বার নহে—'বার দুয়ারির' অর্থ ভগবানের গৃহ। ক্রেটন সাহেব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই সকল গম্বুজ যে স্বুবর্ণ পত্র দ্বারা মণ্ডিত ছিল তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা সুবর্ণ পত্রে মণ্ডিত ছিল বলিয়া কাহারও কাহারও মতে ইহার নাম "সোণামস্‌জিদ।' ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের মতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম 'সোণা-মস্‌জিদ'; কিন্তু বৃহৎ জিনিষকে এদেশে 'সোণা' বলিয়া কখনই অভিহিত করা হয় না।

এই মস্‌জিদ দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফিট ও প্রস্থে ৭৬ ফিট। প্রাচীর ইষ্টক-নির্ম্মিত ও প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। প্রাচীরগুলি ২০ ফিট উচ্চ। অর্দ্ধ-

বড় সোনামসজিদ (১৫২৪ খৃষ্টাব্দে)

গোলাকৃতি ৪৪টী গম্বুজ দ্বারা এই মস্‌জিদ পরিবেষ্টিত ছিল। এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভিত্তিগুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিম-দিকের প্রাচীর-গাত্রে প্রার্থনা করিবার স্থান ও মিরহাব ছিল। অনেকেরই

বিশ্বাস, উত্তর-পশ্চিম কোণের উচ্চতক্ত সম্রাটের অঙ্গনাদিগের প্রার্থনার সময় বসিবার স্থান ছিল। ইহার পূর্ব্ব দিকে তিনটী দ্বারবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ ভগ্নদশায়
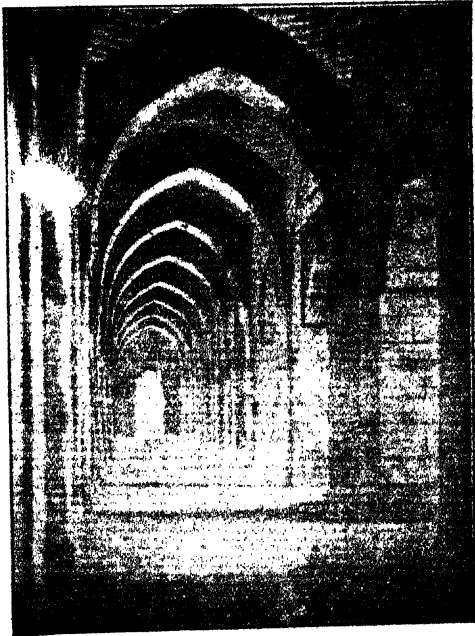
বড় সোণামস্‌জিদের অভ্যন্তর

পড়িয়া আছে। পূর্ব্ব-দ্বারের সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই মস্‌জিদের গঠনকার্য্য ও সুন্দর ক্ষোদনকার্য্য দেখিলে, সম্রাটের শিল্প ও

সৌন্দর্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সম্রাট্-দ্বয়ের সমাধি এখানে আছে।

তাঁতিপাড়া মসজিদের অভ্যন্তর
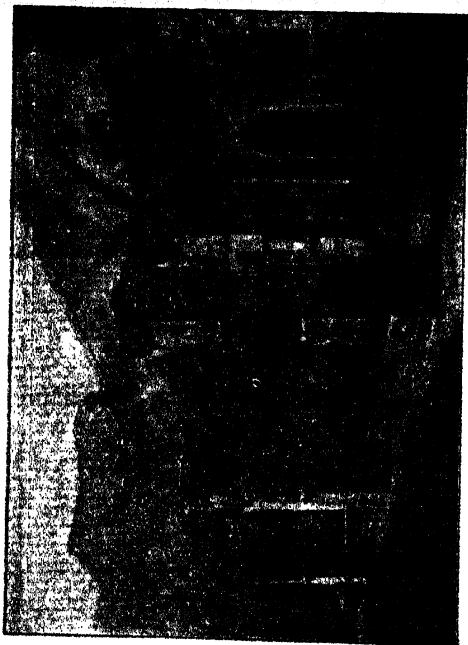
(৭) দাখিল দরওয়াজা

বারদুয়ারীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়া "দাখিল দরওয়াজা" পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে "সেলামী দরজা" বলেন। ইহাই গৌড়

রাজধানী-প্রবেশের সিংহদ্বার। ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত এই অত্যুচ্চ দরজা এক্ষণে ভগ্নদশায় পতিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বে ইহার চারি কোণে চারিটী

বড় সাগর দীঘি
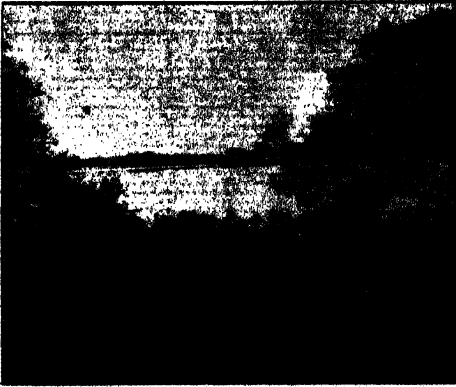
গম্বুজ ছিল। খিলান খুব উচ্চ। ইহাতে ১১৩ ফিট দীর্ঘ ১৪ ফিট বিস্তৃত দ্বার বসান আছে। এই সুবৃহৎ দ্বারের উভয় পার্শে ছোট ছোট চারিটী দ্বার আছে, তদ্দ্বারা প্রহরিগণের ব্যবহৃত গৃহে প্রবেশ করা যায়। এই দরজার মধ্যে গর্ত্তের ভিতর সুবৃহৎ প্রস্তরের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির সাহায্যে দরজা খোলা ও দেওয়া হইত। লোহার খিল বা সুবৃহৎ কাষ্ঠের বন্ধনী দ্বারা এই দরজা বন্ধ করা হইত। এ স্থানে

মীনা-করা ইষ্টক প্রচুরপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কোন লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না; অনেকের মতে ইহা বারবাক্‌শাহ্ কর্ত্তৃক

ঝন্ ঝন্ মিঞা মস্‌জিদ

১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রিয়াজুস্ সালাতিন্-প্রণেতার মতে হোসেন শাহ বাদশাহ্ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য করেন।

(৮) গৌড়দুর্গ

দুর্গ প্রায় ১ মাইল দীর্ঘে ও ৬০০ হইতে ৮০০ গজ প্রস্থে। দুর্গ-প্রাকারের বুনিয়াদ প্রায় ২০০ ফিট চওড়া। উচ্চপ্রাচীরের (Rampart)
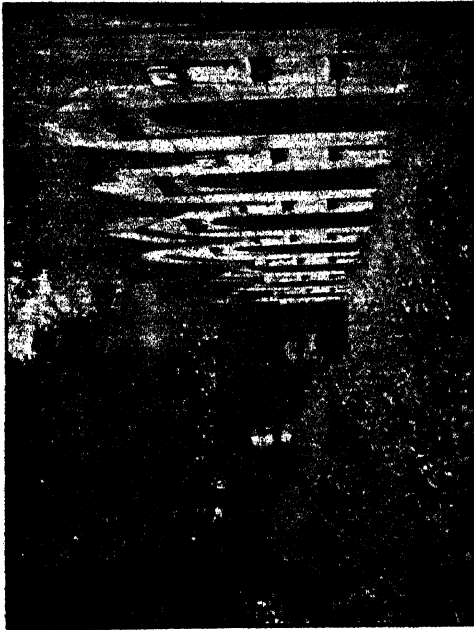
বড় সোনামসজিদ—দক্ষিণদিকের দৃশ্য

উপর পূর্ব্বে গৃহাদি ছিল, কিন্তু এক্ষণে নিবিড় বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। কবে কাহার দ্বারা এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে

পায়া যায় না; তবে কানিংহাম সাহেবের মতে সম্ভবতঃ সম্রাট ১ম মামুদ ও তাহার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বড় সোণামসজিদ উত্তর দিকের দৃশ্য
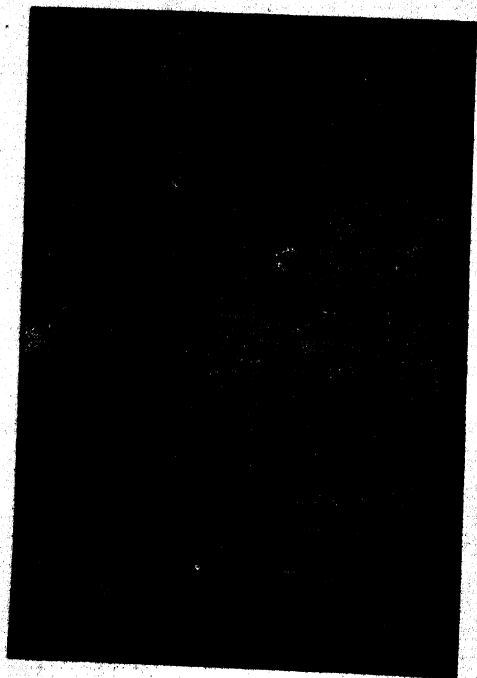
(৯) রাজপ্রাসাদ

দাখিল দরওয়াজা হইতে আর ও কিছু দূর দক্ষিণে গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ। এই স্থানে বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহদাতা সুলতান হোসেন শাহ্ ও তৎপুত্র নসরৎশাহের সমাধি অনাবৃত অবস্থায় আছে। ক্রেটন সাহেব হোসেন শাহ্ ও নসরৎ সাহের সমাধি-ভবনের সুদৃশ্য ফটক-ঘর মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখনও এই ফটক-ঘর সুন্দর শ্বেতনীলাদি বর্ণে রঞ্জিত ও খোদিত ইষ্টকে সজ্জিত ছিল।

রাজপ্রাসাদ হইতে ফিরিয়া পুনরায় দাখিল দরওয়াজার নিকট আসিতে হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে গৌড়স্তম্ভ।

(১০) মিনার গৌড়স্তম্ভ
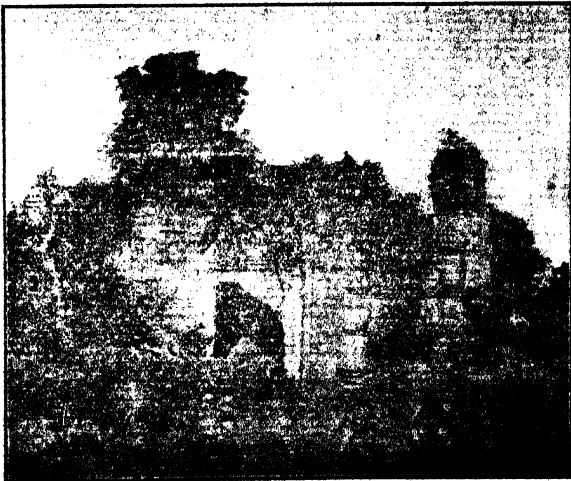
এইখানে আমরা পথ হারাইয়া গিয়াছিলাম। দূর হইতে মিনারের চূড়া দেখিতে পাইতেছি, অথচ মিনারের কাছে যাইতে পারিতেছি না। মিনার হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পথে জনপ্রাণীও

বাইশগজি প্রাচীর

নাই যে, পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া লইব। দৈবপ্রসাদে দেখিতে-পাইলাম একজন তুঁতগাছ কাটিতেছিল, তাহাকে মিনারের পথ দেখাইয়া দিতে বলিলে, সে কিছুতেই যাইতে রাজী হইল না; তখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার কাটা তুঁতগাছে তাহার গুটি-পোকাগুলির আহার সম্পূর্ণ হইবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তাহাকে আমাদের পথপ্রদর্শক
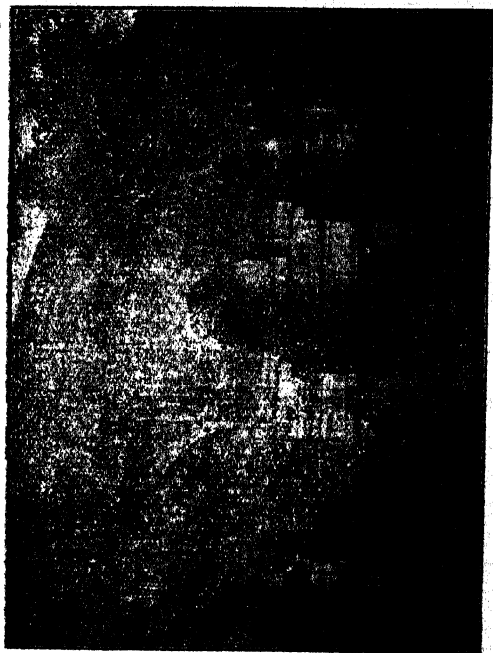
সংস্কারের পূর্ব্বে কদম রসুল

করিয়া লইলাম। তাহার নিকট শুনিলাম, পূর্ব্ব-দরজা দিয়া উত্তর দিকে অর্দ্ধমাইল গেলেই মিনার। নিবিড় বনজঙ্গলের মধ্যস্থ মানব-পদচিহ্নিত সংকীর্ণ পথ ধরিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা মিনারের কাছে আসিয়া পড়িলাম। তাহাকে পারিশ্রমিকস্বরূপ দুই আনা পয়সা দিয়া বিদায় দিলাম।

কদম রসুলের প্রবেশদ্বার

স্থানীয় লোকেরা ইহাকে "ত্রিশূল-মন্দির" বলে। কাহারও কাহারও মতে ইহার নাম "পীরুসা" বা "ফিরোজা" মিনার। ইহা বার-দুয়ারীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণে দুর্গের বহির্ভাগে অবস্থিত। স্থানীয় মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, ইহার উপরে পীর আসা নামক জনৈক সাধু বাস করিতেন, এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম "পীর আসা মন্দির।" ফারগুসনের মতে এই মিনার

দুর্গের পূর্ব্বদ্বার

বা স্তম্ভ ১৩০২ হইতে ১৩১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে জয়স্তম্ভ বলিয়া মনে করেন। র‍্যাভেন্‌শার মতে ধর্ম্ম বিশ্বাসীদিগকে উপাসনার নিমিত্ত আহ্বান করিবার জন্য ইহা ১৪৮৭-৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন শত্রুর গতিবিধি দেখিবার জন্য এই উচ্চ মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে, ইহা আবিসিনিয়ান মালিক ইন্‌ডিল—যিনি দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া, ৮৯৪ হিজীরিতে (১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তিনি ইহা নির্ম্মাণ করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা কিন্তু গম্বুজের কথা স্বীকার করেন না; সেজন্য সংস্কারের সময় মিনারের মস্তকে গম্বুজ দেওয়া হয় নাই। ইহা প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। বুনিয়াদে মোটা অমসৃণ মার্ব্বেল ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবেশদ্বার কষ্টি-পাথরের ও ইহার সম্মুখে কারুকার্য্যযুক্ত তিনটি গোলাপ ফুল আছে। এরূপ একটি গোলাপফুল রামকেলি গ্রামে মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন আছে। আমাদের প্রদত্ত চিত্রেও তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্তম্ভের উপর দ্বারটি দণ্ডায়মান, তাহা লতাপুষ্পে অলঙ্কৃত। মিনারের উচ্চতা ৭০ হইতে ৮০ ফিট এবং পরিধি ৩২ ফিট। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া (Spiral) ঘোরাল সিঁড়ি দিয়া ৬৭টি ধাপ উঠিতে পারিলে মিনারের উপরিস্থিত গম্বুজের নিকট পৌছান যায়।

(১১) বাইশ-গজী প্রাচীর

মিনার হইতে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলে, জঙ্গলাকীর্ণ একটী উচ্চ প্রাচীর দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "বাইশ-গজী" বা "ঘোড়-দৌড়" প্রাচীর। উচ্চতা ৬৬ ফিট। এখানে অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত

হইয়া আছে। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে বারবক্ শাহ্ ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার কিছু দক্ষিণে অনেকগুলি বাঁধ আছে। এক একটির উপর এক একটি দরজা আছে। ইহার মধ্যে একটির নাম 'চাঁদ দরজা'। ইহা প্রাসাদ-প্রবেশের বিজয়-দ্বাররূপে ব্যবহৃত হইত।
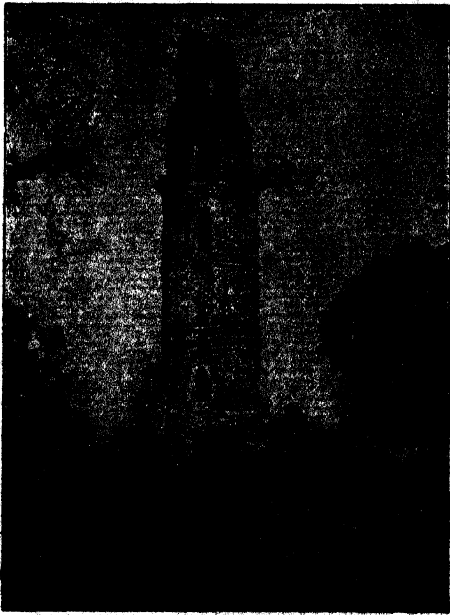
সংস্কারের পূর্ব্বে মিনার

দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রাসাদ ছিল। পূর্ব্বে প্রাসাদ তিন অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে 'দরবার মহল', দ্বিতীয় অংশে নবাবের 'খাসমহল' ও তৃতীয় অংশে 'বেগম মহল' ছিল। প্রাসাদের প্রাচীর ৪২ ফিট উচ্চ ও ১৫ ফিট চওড়া। এখনে বাঘ ধরিবার জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার ভিতরে একটি ছাগশিশু রহিয়াছে।

(১২) কদমরসুল

প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে কদমরসুল মস্‌জিদ অবস্থিত। এই মস্‌জিদের একটি মাত্র গম্বুজ আছে এবং চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মিনার আছে। এই মস্‌জিদের অবস্থা বেশ ভাল। ফ্রাঙ্কলিন সাহেব এই মস্‌জিদের প্রাচীরে শ্বেত নীল ইষ্টক সজ্জিত দেখিয়াছিলেন। এখানে একটি পদচিহ্ন আছে। স্থানীয় মুসলমানেরা ইহাকে হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের নিকট পরম পবিত্র পদার্থ। হিন্দুরা ইহাকে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদচিহ্ন বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইহা গৌড় হইতে মুর্শিদাবাদে লইয়া যান, পরে মিরজাফর আবার ইহা গৌড়ে প্রত্যর্পণ করেন। পূর্ব্বে ইহা পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় ছিল। ৯৩৭ হিজরীতে (১৫৩০ খৃষ্টাব্দে) নসরৎ শাহ্ কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার পশ্চিম দিকে একটি দোচালার আকৃতি ঘরে অনেকগুলি কবর দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সম্ভবতঃ নবাব হোসেন শাহ্ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের বড় বড় কর্ম্মচারীদের কবর। প্রবাদ আছে এইস্থলে রাজনৈতিক কয়েদীগণ বন্দীভাবে থাকিত।

যে শিলালিপি এক্ষণে ইহার দ্বারে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, ইহা নবাব মহম্মদ শাহের পৌত্র, নবাব [illegible]

পুত্র নবাব শামসুদ্দিন আবুল মোজাফর য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে ১০ই রমজান ৮৮৫ হিজরী সালে (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছে।

ক্রেটন সাহেব এই শিলা-লিপিখানি পূর্ব্বে তাঁতিপাড়া মসজিদে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এটি তাঁতিপাড়া মসজিদেরই।

কোতোয়ালি দরওয়াজা
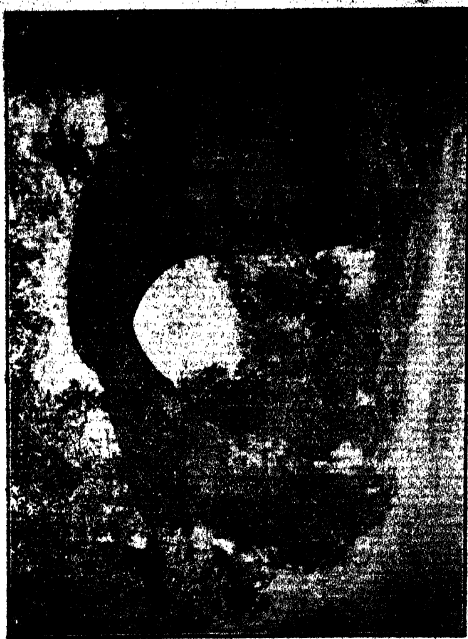
(১৩) ফতে খাঁর সমাধি

কদম রসুলের ভিতর বাঙ্গলার চালাঘরের মত স্থানে ফতে খাঁর সমাধি

দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আরাঙ্গজেবের সেনাধ্যক্ষ দিলীর খাঁর পুত্র। কথিত আছে, শাহ্ নিয়ামাতুল্লা ওয়ালীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্ আওরাঙ্গ্জেব দিলীর খাঁকে গৌড়ে পাঠান। সম্রাটের সন্দেহ হইয়াছিল যে, নিয়ামাতুল্লার পরামর্শেই সুজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। দিলীর খাঁ গৌড়ে পদার্পণ করিবামাত্র, তাঁহার প্রিয়পুত্র ফতে খাঁ রক্ত বমন করিয়া মারা যান; এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি দৈবের হস্ত স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিলেন বিনা দোষে সাধুর প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে আসা কথনই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। সাধুর প্রশান্তমূর্ত্তি, সহজ সরল আনন ও নম্র স্বভাব দেখিয়া ভক্তি বিনম্রচিত্তে তিনি সাধুর চরণে প্রণত হইলেন, এবং কয়েকদিন তাঁহার নিকট সুধামাখা উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া শোকে শান্তিলাভ করিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(১৪) চিকা মস্‌জিদ

কদম রসুলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে এক অতি পুরাতন মস্‌জিদ আছে ইহার গম্বুজটি অতি বৃহৎ। বহুসংখ্যক বাদুড়ের বাসস্থান আছে বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে 'চিকা মসজিদ্' বলিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, ইহা পূর্ব্বে দরবারগৃহ বা কয়েদখানা ছিল। এখানে দেশ-দ্রোহীরা আবদ্ধ থাকিত। এ ভবনের তিন দিকে মোটা রকমের পাথরের থাম দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে প্রহরীদের থাকিবার জন্য বারান্দা ছিল। এখানে এখন কোন শিলা লিপি নাই; তবে পূর্ব্বে যে ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। সম্ভবতঃ ইহা ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঠন-বিষয়ে পাণ্ডুয়ার এক-লাখী মস্‌জিদের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন, বোধ হয়, ইহা যদু জালালুদ্দীনের পুত্র প্রথম মামুদের গোরস্থান।

ফিরোজপুর গেট দরওয়াজা

(১৫) গুম্‌তি দরওয়াজা
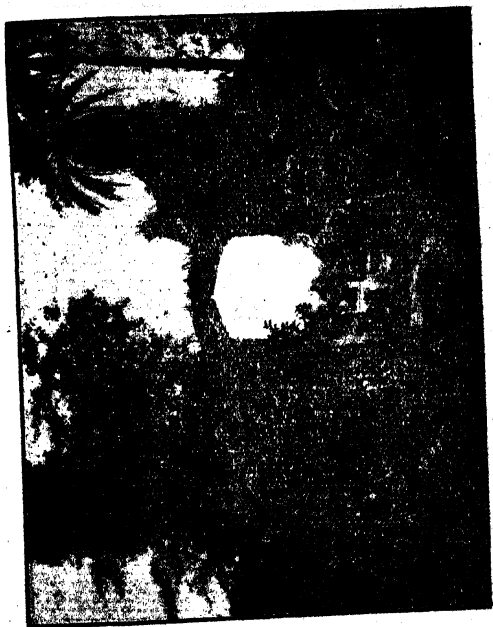
'চিকা মসজিদে'র অতি নিকটে দুর্গের পূর্ব্বদরজার কিছু দক্ষিণে এক গুম্বজ-বিশিষ্ট মসজিদ আছে, সাধারণতঃ লোকে ইহাকে 'গুম্‌তি' বলে। পূর্ব্বে কয়েদীগণের জেল প্রবেশের ইহাই দরজা ছিল।

বড় সোণামসজিদের পশ্চাদ্ভাগ

(১৬) খাজাঞ্চিখানা।

কদম রসুল হইতে প্রায় ২০ রশি উত্তর-পশ্চিমে বাইশগজী প্রাচীরের ভিতর খাজাঞ্চিখানা অবস্থিত। ইষ্টকনির্ম্মিত এই ভবনে 'হারেম' বা 'মহালসরাই' এর ধনাগার ছিল। সাধারণতঃ লোকে ইহার একখণ্ড

ছোট সোনামসজিদ

ভূমিকে 'ভাবাক' (থাজাঞ্চিথানা) বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণীর নাম 'টাঁকশাল দীঘি'।

(১৭) গম্বুজ গসুল ঘর

সংস্কারের পরে কদমরসুল

ইহা একটী উচ্চ গম্বুজবিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র গৃহ। কদমরসুল মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ইহা রমণীদিগের 'হামাম্‌' বা স্নানাগার ছিল।:

(১৮) 'লুকাচুরি' দরওয়াজা।

সংস্কারের পরে বারদুয়ারির সম্মুখভাগ
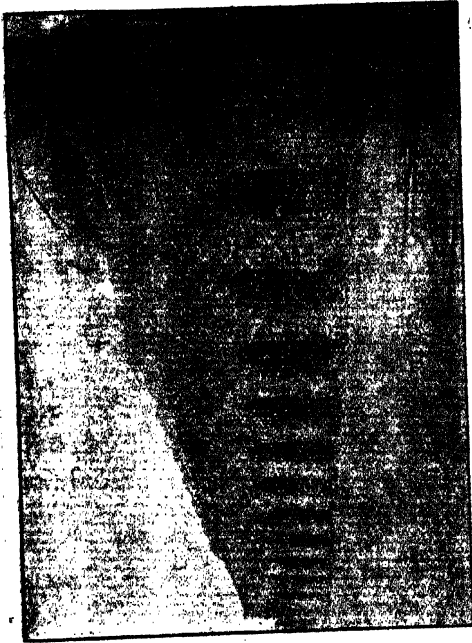
কদম রসুলের দক্ষিণ-পূর্ব্বে বৃহৎ দ্বিতল দরজা আছে; ইহাই পূর্ব্বে দুর্গের পূর্ব্বদ্বার ছিল। ইহারই নাম 'লুকাচুরি' দরওয়াজা। ইহা রাজপরিবারবর্গের দুর্গপ্রবেশদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। কানিংহাম সাহেব বলেন, ইহা

হোসেন শাহ্ ১৫২২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। পরে গৌড়ধ্বংসের পর শাহ্ সুজা ১৭২৫ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পুনঃ-সংস্কার করেন। ইহার ভিতর দিয়া শাহ্ সুজা হাওদাসহ হস্তি-যোগে প্রাসাদে প্রবেশ করিতেন। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বে শাস্ত্রিগণের থাকিবার স্থান আছে, এবং ইহার উপরে 'নাগারখানা' (দামামা বাজিবার স্থান) আছে। গৌড়ের ভিতর কেবল মাত্র এই দরজার দেওয়ালে চূণকাম আছে।

ফিরোজপুর প্রস্তরলেখ
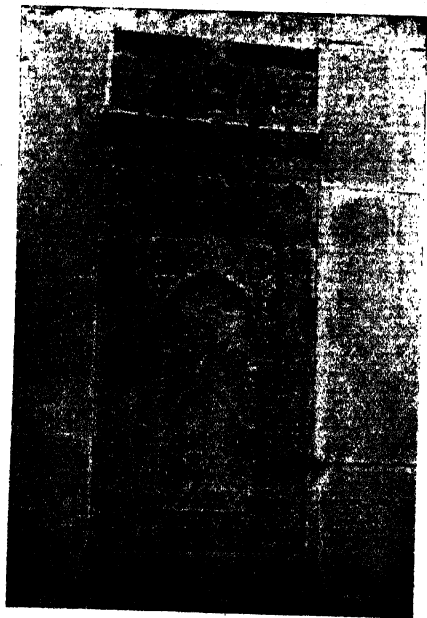
(১৯) বাংলা কোট

'বাজাজি'র কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বে ও কদম রসুলের উত্তর-পশ্চিমে বাংলা
কোট অবস্থিত। মহদিপুরের লোকেরা এই স্থানকে 'বাংলা কোট'
বলিয়া থাকে। এখানে অনেক কবর আছে। কাহারও কাহারও
মতে হোসেন শাহ ও তাঁহার পত্নীর কবর না কি এইখানে ছিল।

(২০) তাঁতিপাড়া মসজিদ

লুকাচুরি দরজা হইতে পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া বাদশাহী রাস্তায়
পঁহুছিবার পথে পূর্ব-পশ্চিম পার্শ্বে "তাঁতিপাড়া মসজিদ।" নবাবগঞ্জ
রাস্তার একাদশ মাইলের নিকট ইহা অবস্থিত। বর্তমান কালে ইহাই
গৌড়ের সুন্দরতম মসজিদ। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৭৪ হইতে
১৪৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে এই মসজিদ জনৈক উমর কাজি
কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তাঁতিপাড়ায় অবস্থিত বলিয়া ইহার ঐরূপ
নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে অর্দ্ধগোলাকৃতি দশটী গম্বুজ ছিল। ১৮৮৫
সালের ভূ-কম্পনে ঐগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মসজিদটি রক্তবর্ণ
কারুকার্য্যসমন্বিত চিত্রবহুল মীনাকরা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। পূর্ব্বে
মসজিদের ভিতর উত্তর-দিকে 'তক্ত' ছিল। মসজিদের পূর্ব দিকে নির্মাতা
ও তাঁহার কন্যা দুল [illegible] সমাধি আছে। আবার কাহারও কাহারও
মতে ইহা—উমীর কাজি ও তাঁহার ভ্রাতার সমাধি।

ছোট সোনা মসজিদ জেনানা মহলের সম্মুখ
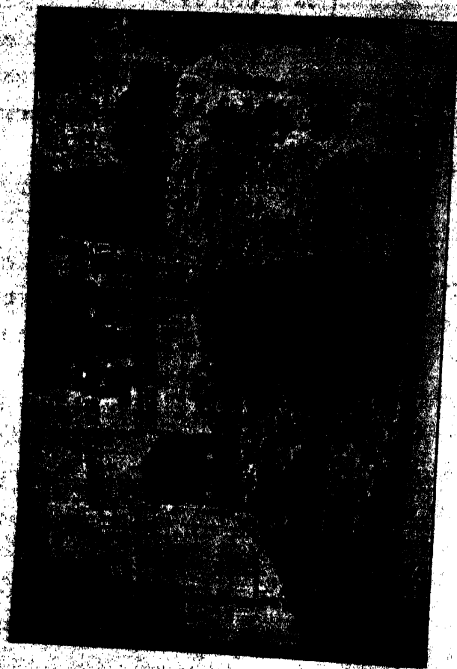
(২১) লুটন মসজিদ

'তাঁতিপাড়া মসজিদে'র পর একটি ক্ষুদ্র তোরণের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বাদশাহী রাস্তায় পড়িতে হয়। রাস্তার বামপার্শ্বে এই মসজিদ। শ্বেত, নীল, হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত মীনাকরা ইষ্টক দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। কেহ কেহ

স্থপতি-কৌশল, বর্ণ-বৈচিত্র্য, সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন সাহেব ইহার মত চারু ভাস্কর্য্য, নির্ম্মাণ-কৌশল ও সাজসজ্জা উত্তর-ভারতের আর কোনও স্থানে দেখেন নাই বলিয়াছেন। গ্রোট সাহেব বলেন, 'তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে এরূপ সুন্দর হাল্‌কা গাঁথুনির কারুকার্য্যযুক্ত ইমারৎ দেখেন নাই।' তিনি ইহাকে 'নাচু' বা 'নর্ত্তকী বালিকার মস্‌জিদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস ও প্রবাদ এইরূপ যে, 'চুটন' বা 'মীরাবাই' নামী নর্ত্তকী ইহার নির্ম্মাত্রী। ক্রেটন সাহেবের মতে [illegible] ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইয়ুসুফ শাহ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে হইলে ৩৫ ফিট দীর্ঘ, ১১ ফিট প্রস্থ এবং ডোম সহিত ৫০ ফিট উচ্চ একটি খিলানযুক্ত বারান্দার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বারান্দাসহ মস্‌জিদটির ক্ষেত্রফল ৮০০ বর্গফুট। বারান্দার উপর অপর তিনটি ডোম আছে। বিপুলকায় গম্বুজগুলি, সরু স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভের দৈর্ঘ্য দশ ফিট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কি করিয়া এগুলি [illegible] মস্তকে দণ্ডায়মান আছে—কিরূপে সরু স্তম্ভগুলি ভারসহ হইয়াছে! [illegible] মিনারেট এই মস্‌জিদের বহির্ভাগে আছে। বাদুড়দিগের [illegible] হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই মস্‌জিদের খিলানের [illegible] দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে যে মস্‌জিদের [illegible] সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া [illegible]।

[illegible] কোতোয়ালী দরওয়াজা

[illegible] কোতোয়ালী দরওয়াজা” দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গৌড়ের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী

সিংহ-দরজা। এই প্রাচীর ভেদ করিয়া এক সুন্দর খিলান ছিল। কাল-বশে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। খিলানের নিম্নস্থ রাস্তা ১৭ ফিট ৬ ইঞ্চি। খিলানটি ৩০ ফিট উচ্চ, এবং কথিত আছে ইহার উভয় পার্শ্বে সহর-কোতোয়ালদিগের থাকিবার জন্য অর্দ্ধগোলাকার কক্ষসমূহ ছিল। এই দরওয়াজার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কামান ও বন্দুক ছুঁড়িবার গর্ত্তসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরওয়াজাকে 'সেলামী দরওয়াজা'ও বলে।

কোতোয়ালি দরওয়াজা

পথে বড় রাস্তার বামদিকে "ছোট সোনা মসজিদ" অবস্থিত। ইহাকে লোকে 'জাম-ই-মসজিদ' ও 'খোজা-কি-মসজিদ' বলিয়া থাকে। শেষোক্ত নাম হইবার কারণ—জনৈক খোজা ইহার নির্ম্মাতা। মালদহের পূর্ব্বতন কালেক্টার বাহাদুর পোর্চ্চ সাহেবের মতে, ইহা হোসেন শাহের বেগমমহলের রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী দরওয়াজার উপর

য, ইহার কতকগুলি তাহাদের ধর্মান্ধতারও পরিচয় দিয়া থাকে ; হিন্দুর শিল্পস্মৃতি লোপ করিয়া—হিন্দুর দেবদেবী-মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া প্রস্তরগুলি মস্জিদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামকেলি

(২৫) রামকেলি

বারদুয়ারী মস্‌জিদ ও পিয়াস বাড়ীর মধ্যে রামকেলি গ্রাম। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থ-স্থান। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন অযাচিত-ভাবে নাম বিলাইয়া ও অকাতরে প্রেম বিতরণ করিয়া বন্যার ন্যায় জনসঙ্ঘকে সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে ভাসাইয়া লইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে ছুটিতেছিলেন, তখন গৌড়ের মধ্যে রামকেলি গ্রামে তমালতলে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাচুম্বকের মহা আকর্ষণে লৌহ-কঠিন প্রাণ বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ থাকিতে পারেন নাই; আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নাম-জ্ঞান-ভক্তি প্রেমের জলন্ত হুতাশনে বাদশাহের অমাত্য রূপ-সনাতন-পতঙ্গ ভস্মীভূত হইয়া প্রভুর অমৃত-পরশে নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সংসারে লজ্জা-মান-ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে স্থান পাইবার জন্য তাঁহারা ছুটিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আগমনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এখানে বৈষ্ণবগণ মহা-মহোৎসব করিয়া থাকেন।

রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতন-সেবিত শ্রীশ্রী ৺ মদনমোহন ঠাকুরের জীর্ণ মন্দির ও শ্রীল সনাতন-প্রতিষ্ঠিত সনাতন-সাগর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড নামক পুষ্করিণী হিন্দুদিগের নিকট চিরপূজিত হইয়া থাকিবে। মদনমোহন জীউর মন্দিরের অনতিদূরে মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থানজ্ঞাপক বাঁধান বেদীর উপর কেলিকদম্ব বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

কেলিকদম্ব হইতে রামকেলির মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই শ্রীরূপগোস্বামী খনিত সুবৃহৎ "রূপসাগর" দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বপার্শ্বে "গোরদা" নামক স্থানে শ্রীরূপগোস্বামীর বাটী ছিল।

এই সকল দেখিয়া সন্ধ্যার পরে পিয়াসবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শরীরের দুর্ব্বলতার জন্ত বন্ধুদিগের সহিত আমিও যৎসামান্ত জলযোগ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

ফিরিবার পথে কণ্ট্রাক্টর বাবুকে প্রাণের সহিত ধন্তবাদ দিলাম। তাঁহারই কৃপায় আমরা যে বিফলমনোরথ হই নাই, হিন্দু-মুসলমানের কীর্ত্তি-চিহ্ন—স্মৃতির-শ্মশান দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার অবসর পাইয়াছি, মহাপ্রভুর শ্রীচরণসেবিত পুণ্য-পদরজে পবিত্রীকৃত কেলিকদম্ব দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতে পাইয়াছি, তাহার জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ না দিলে আমাদের প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইত। আমাদের সহিত প্রাতঃকালের ব্যবহারের কথা ভুলিয়া যাইবার জন্ত তিনিও বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি আমাদের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গঠন-প্রণালী

এক্ষণে আমরা গৌড়-পাণ্ডুয়ার গৃহগুলির নির্ম্মাণপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। ফারগুসান্-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, মুসলমান শিল্পীরা 'সারাসেন' প্রণালীমতে মস্‌জিদগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু কলাকুশলী হ্যাভেল সাহেব এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন। এগুলির পরিকল্পনা হইতে নির্ম্মাণ-প্রণালী পর্য্যন্ত সকলই হিন্দু-বৌদ্ধদিগের গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুরূপ। আদিনার মিহ্‌রাবের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—The beautiful mihrab of the fourteenth century Adina mosque at Gour is so obviously

Hindu in design that it hardly requires any comment. অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সুন্দর নিরহাব গৌড়ের আদিনা মস্‌জিদের পরিকল্পনা একেবারে খাঁটি হিন্দু আদর্শে যে নির্ম্মিত, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা দেশের রাজমিস্ত্রিরা বিস্তৃত খিলান (radiating arches) ব্যবহার কালে হয় বর্তুলাকার (round), না হয় বিন্দু-প্রসারী (pointed) করিয়া নির্ম্মাণ করে। খিলান ও গম্বুজ (vault) বৌদ্ধযুগের শিল্পীরা সর্ব্বত্র ব্যবহার করিত এবং ইহা তাহারা বাঙ্গালী মিস্ত্রিদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। ফারগুসান সাহেব বিন্দু-প্রসারী খিলান নির্ম্মাণ প্রণালী আফগানদের নিজস্ব বলিয়াছেন, এবং গৌড় বাসীরা তাহাদের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ভ্রান্তমত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আফগানদিগের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের এইরূপ খিলানের শত শত নিদর্শন স্তূপ-প্রোথিত চৈত্য, বিহার ও গুহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আর আফগানেরা যখন এদেশে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া আগমন করিয়াছিল, তখন তাহাদের ভিতর কয় জনই বা রাজমিস্ত্রির কার্য্য জানিত যে তাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে। হ্যাভেল সাহেব তাঁহার 'Indian Architecture' পুস্তকে এ বিষয়ে নানারূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্থির করিয়াছেন,—"That all the early Muhammadan buildings at Gour are adaptations of local Hindu-Buddhist building traditions, both structurally and decoratively; that the brick-builders of Bengal, like the brick-builders of Persia, used the radiating arch before there was any architecture to be called "Saracenic"— অর্থাৎ গৌড়ের প্রাচীন বাড়ীগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্যে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধযুগের

পুরাতন গাঁথুনী প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক গাঁথুনীগুলিও ঐ সকল সময়ের অনুরূপ। সারেসেন-প্রথা প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে পারস্য দেশের রাজমিস্ত্রিদের মত, বাঙ্গলার রাজমিস্ত্রিরা বিস্তৃত খিলান ব্যবহার করিয়াছে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত কদম রসুলের খিলান ও ও ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বিষ্ণুপুরের মদনমোহন দেবের মন্দিরের খিলানের তুলনামূলক আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়ের নির্ম্মাণ-কৌশল একই প্রকারের, উভয়ই স্থানীয় হিন্দু আমলের। হিন্দু ও মুসলমানদিগের গাঁথুনীর প্রণালীর ভিতর পার্থক্য খুবই অল্প। অধিকাংশ স্থলে হিন্দুদিগের খিলান বিন্দু-প্রসারী (pointed)। এগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত চূড়াগুলির সংযোগ করিয়া দিত এবং বৃত্তাকার ছাদকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিত। হিন্দুদিগের মন্দির বহুলোক সমাগমের জন্য নির্ম্মিত হইত না বলিয়া এইরূপ ভাবে তৈয়ারী হইত। আর মুসলমানদিগের প্রার্থনা-স্থানে ও মসজিদে বহুলোকের সমাবেশ হইত বলিয়া বড় করিয়া তৈয়ারী করা হইত, সুতরাং ভারক্ষম করিবার জন্য খিলানগুলি বৃত্তের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের হইত। হিন্দুরা যে আবশ্যক হইলে এরূপ করিতে পারিত না, তাহা সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়ের বক্রভাবে নির্ম্মিত কার্ণিশগুলি (curvilinear cornices) এবং ছাদ সকলও স্তম্ভশীর্ষ (capital) ও গম্বুজ (dome), প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশলানুকারী। সুবিন্যস্ত টালিগুলি অবশ্য পারসীক শিল্পীদের নিকট হইতেই গৃহীত।

পঞ্চদশ শতকে নির্ম্মিত 'দাখিল দরওয়াজা' 'কোতোয়ালী দরওয়াজা' ও দুর্গের অন্যান্য প্রবেশদ্বার এবং 'একলাখী' মসজিদের নির্ম্মাণ কৌশল কিছু দিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত গাঁথুনীর আদর্শ ছিল। ছোট সোনা মসজিদের দুইটি কার্ণিশের অধোভাগের (orchitraves) প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখিতে

গৌড় ত্যাগ করিয়া দিল্লী আগ্রার দিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং তথাকার শিল্পীদের সহিত মিলিত হইয়া নূতন ভারতীয় গাথুনী-প্রণালী উদ্ভাবন করে।

পরিশেষে আমরা হ্যাভেল সাহেবের আর একছত্র উদ্ধৃত ক[illegible] প্রবন্ধ [illegible] উপসংহার করিলাম। "The craftsmanship of [illegible] built mosques and tombs in India owed far mo[illegible] Bengal than to Persia" P. 128. অর্থাৎ—ভারতের ইষ্টক[illegible]ত মসজিদ ও কবরের নির্ম্মাণ কৌশল পারস্যদেশ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় বাঙ্গলার নিকট ঋণী।

শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই,

এম, এল, সি মহাশয়ের নামে প্রবর্ত্তিত

হৃষীকেশ-সিরিজ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

Approved by the Director of Public Instruction as a Prize and Library Book.

২। পাখীর কথা মূল্য—২৷৷৹

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল ; এফ্-জেড্-এস্ প্রণীত

৩। ভারত-পরিচয় মূল্য—২৸৶৹

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৪। কান্তকবি রজনীকান্ত মূল্য—৪৲

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৫। চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ মূল্য—১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ প্রণীত

পরে বাহির হইবে

১। বৌদ্ধধর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

২। স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৩। বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

দুর্গাচরণ সিরিজ

১। কথামৃত মূল্য—৷৷৹

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত

২। গৌড় পাণ্ডুয়া মূল্য—৸৹

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম, এ, বি এল প্রণীত

এষা (নবপ্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—৸৹

কবিবর অক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত।